উৎসর্গ

শ্রীমান্ মিহির ও শ্রীমতী গৌরী

পরমস্নেহভাজনেষু

ভাগ্যবন্ত বলি কারে? যারা সদা শ্রদ্ধাভরে
শুভা ইন্দিরা-সঙ্গীত-বাণী বরণ করিতে পারে:
ত্যজিয়া মনের সীমাবদ্ধ ছোটস্বার্থ অন্তরে
মানস-অতীত সত্যের যারা চরণ ধরিতে পারে;
"কৃষ্ণশক্তি" মীরার আশিস যাহারা মাথায় ধরে,
যাহার মন্ত্রদীক্ষা জীবের মরণ হরিতে পারে:
ধার্মিক-সাথে সহধর্মিণী—যুগলে যাহারা স্মরে:
"অকূলে কেবল বিপুলের বাঁশি-স্বনন ভরিতে পারে।"

২৯. ৫. ৫৫

স্নেহাধীন
দিলীপ

ভূমিকা

মেবারের মহারাণী মীরাবাঈ হিন্দুস্থানের লক্ষ লক্ষ সাধক কবি ভক্তের হৃদয়ে এমন একটি স্থান অধিকার ক'রে আছেন যার সংজ্ঞা নির্ণয় করা খুব সহজ নয়। কারণ মীরার জীবন সম্বন্ধে আমরা যেটুকু জানি, তাঁর ভজনের বাণী যেটুকু আমরা বুঝি, তাঁর-কাছ-থেকে-পাওয়া প্রেরণার যেটুকু আমাদের অন্তর্লোকে থিতিয়ে গেছে সেটুকুর চেয়ে অনেক বেশি আমরা পাই তাঁর কাছ থেকে যেন উত্তরাধিকারসূত্রেই বলব, যদিও অঙ্ক ক'ষে পুরোপুরি বার করতে পারি না এই অতিরিক্ত লাভের জমাটুকু। বলতে কি, মীরা আমাদের কাছে খানিকটা পৌরাণিকী কথিকার মতই প্রেরণা দিয়ে এসেছেন। অর্থাৎ তাঁর কথা যখন আমরা ভাবি তখন হিসেবে ভুল হ'য়ে যায়—তাঁর জীবনের কতখানি ইতিহাস কতখানি কিম্বদন্তী। সাধারণ মানুষ কী জানে তাঁর সম্বন্ধে? না, তিনি ছিলেন মহারাণী, হয়েছিলেন ভিখারিণী—কৃষ্ণপ্রেমে, শোনে তাঁর নানা গান যেসব গানের সামান্য ভগ্নাংশ মাত্র তাদের কাছে বাস্তব; কল্পনা করে সবিস্ময়ে—কেমন ক'রে তিনি "ধ্রুবাণি পরিত্যজ্য" অধ্রুবকে বরণ করবার সাহস পেলেন—বিলাসের দুলালী হ'য়ে কেমন ক'রে পারলেন উপবাসের সঙ্গে মিতালি করতে? এর বেশি আমরা এমন কিছুর হদিশ পাই না তাঁর কাছ থেকে যার কোনো পরিষ্কার বর্ণনা করতে পারি। অথচ শুধু অনেক বুদ্ধিবাদী অবিশ্বাসীরও যে তাঁর গান শুনে চোখে জল আসে এ অবিসংবাদিত সত্য। সময়ে সময়ে এমনো মনে হয় যে মীরার জীবন আমাদের আবিষ্ট করে খানিকটা সেইভাবে যেমন করে পুরাণ

যাকে ইংরাজিতে বলে "মিথলজি"—রূপকথা। অবশ্য পুরাণ থেকে সবাই পায় না যা তারা পেতে পারত যদি ঠিকম'ত চাইত। তাই বিবেকানন্দ বলেছিলেন একটি গভীর কথা তাঁর "ইনস্পায়ার্ড টক্‌স্‌"-এ: "পুরাণের রসগ্রহণ করো—যেমন করো কাব্যের। পৌরাণিকী কথাকে দেখতে যেয়ো না ঐতিহাসিকের চোখ দিয়ে। তার স্রোত তোমার মনে ব'য়ে যাক যেমন ব'য়ে যায় জলস্রোত; তার পানে চেয়ে থাকো যেমন চেয়ে থাকো দীপারতির পানে—জানতে না চেয়ে কে করছে আরতি। তাহ'লে বৃত্ত হবে পূর্ণ: সত্যের সারাংশ থিতিয়ে যাবে তোমার অন্তরে।"

মীরার জীবন-ইতিহাস দেশ ক'রি এইভাবেই থিতিয়ে গেছে—অন্তত তাদের মনে যারা তাঁকে দেখতে চেয়েছে এই দৃষ্টি দিয়ে, গান শুনতে চেয়েছে এই শ্রুতি দিয়ে।—তাই তো তাঁর স্বল্পায়ু জীবনের (১৫০২—১৫৭৭ খৃঃ) গাথাও আমাদের কাছে হ'য়ে উঠেছে এত মহার্ঘ। বুঝি না আমরা এ-জীবনের পুরোপুরি মর্ম, অথচ সেই না-বোঝার মধ্যে দিয়েও পাই অনেক-কিছু। তাই তো তাঁর পুণ্য-জীবন লক্ষ লক্ষ চেতনাকে কম-বেশি উদ্বুদ্ধ ক'রে এসেছে এই চার শতাব্দী ধ'রে। মানবী হয়েও তিনি যেন মানবতার গণ্ডী গেছেন পেরিয়ে—উত্তীর্ণ হয়েছেন দেবীর পর্যায়ে। বিশেষ ক'রে এইজন্যে যে তাঁর জীবন আমাদের কাছে প্রতীয়মান হয় সেই আশ্চর্য চেতনার আলোকস্তম্ভ রূপে যার ভূমিকায়—বিবেকানন্দের ভাষায়—"প্রতি নিশ্বাস হ'য়ে ওঠে প্রার্থনার বাহন।"

হয়ত অপরের সম্বন্ধে একথা বেশি জোর ক'রে বলতে না যাওয়াই ভালো। কিন্তু একথা নির্ভয়েই বলতে পারি যে—যে-কারণেই হোক—আমি তাঁকে আশৈশব এই চোখেই দেখে এসেছি—শুনে এসেছি তাঁর কথা এই শ্রুতি দিয়েই—গেয়ে এসেছি তাঁর গান এই ভাবের ভাবী

হ'য়েই। ঐতিহাসিক যত চরিত্র আমাকে দিয়েছে অভীপ্সার ও মঙ্গলের পাথেয় তাদের মধ্যে তাঁর চরিত্র পেয়েছে শিখরের মান, ইন্দ্রধনুর প্রভাপ্রেরণা, পুরাণের পদবী: কেমন এ-মহীয়সী যিনি শুধু চাঁদের পানে হাত বাড়িয়েই ক্ষান্ত হন নি, সে চাঁদকে হাতে পেয়ে জানিয়ে গেছেন যে "উদ্বাহু" হ'লে "বামন" মানুষও পারে আকাশকে ছুঁতে—ত্রিভুবনেশ্বরকেও পেতে পারে খেলার সাথী, বলতে পারে প্রেমের অপরাজেয় অভিমানে:

"গোবিন্দ লীনো মোল মাঈ ময়্ লীনো গোবিন্দ মোল"—
"লয়েছি গোবিন্দেরে কিনিনা সজনি আমি গোবিন্দে কিনেছি অতুলা।'

এখানে আমাকে ভুল বোঝার অবকাশ আছে। তাই ব'লে রাখা ভালো যে মীরার চরিত্র খানিকটা পৌরাণিক কোঠায় পড়লেও তার ঐতিহাসিকতা নামঞ্জুর এমন কথা আমি আদৌ বলতে চাই নি। অন্তত এটুকু তো আমরা সবাই জানি—বিশেষ ক'রে সাম্প্রতিক ঐতিহাসিকদের গবেষণার—যে, তিনি ছিলেন রাজকন্যা, হয়েছিলেন মহারাণী, ছেড়েছিলেন প্রেমের জন্যে প্রাসাদ বিলাস দেহসুখ, গেয়েছিলেন সগৌরবে:

"ছাড় দাসি আন মান কুলকি কান চোড়ি,
ছাড় তাত মাত বন্ধু জগসে মুখরা মোড়ী'—

অর্থাৎ

"পিতা মাতা সখা বন্ধু ছেড়েছি দিয়েছি গো, কুলে কালি,
ছেড়েছি জগৎ, মান অভিমান, চেয়ে শুধু বনমালা।"

আরো জানি—তিনি পথে পথে ভিক্ষান্নে জীবনধারণ ক'রে কৃষ্ণবিরহের গান গাইতে গাইতে মেবার থেকে সুদূর বৃন্দাবন পর্যন্ত গিয়েছিলেন পদব্রজে—তাঁর গুরু সনাতনের চরণে শরণ নিতে।

কিন্তু সৌভাগ্যবশে আমরা তাঁর জীবন সম্বন্ধে আরো অনেক তথ্য জানতে পেরেছি—যে-সব তথ্য অশ্রদ্ধালুর কাছে প্রামাণ্য না হ'লেও আশা রাখি—সত্যার্থীর কাছে সত্যের মান পাবে যেহেতু সে-সব তথ্য আমরা জানতে পেরেছি তাঁর স্বকথিত কাহিনী থেকে। ব্যাপারটা বলি।

আমার শিষ্যা ইন্দিরা দেবী শ্রীঅরবিন্দ আশ্রমে প্রথম আসেন ১৯৪৯ সালে ফেব্রুয়ারী মাসে। কয়েক মাস পরেই তাঁর ভাবসমাধি সুরু হয়। ঘণ্টার পর ঘণ্টা তিনি থাকতেন—এখনো থাকেন—সমাধিস্থ—এবং সে-অবস্থায় অনেক সময়েই ভাবনেত্রে দেখতেন মীরার রূপ, ভাব-শ্রবণে শুনতেন মীরার গান। এ-গানগুলি "শ্রুতাঞ্জলি" নামক গীতিগুচ্ছে শ্রীঅরবিন্দ আশ্রম থেকে সম্প্রতি প্রকাশিত হয়েছে। কিছুদিন পরে মীরা তাঁকে নানা কথা বলতে সুরু করেন, নানা বাণী, কথিকা, উপদেশ—পরিশেষে নিজের জীবনকাহিনী। এসবের কিছু কিছু লিপিবদ্ধ হয়েছে শ্রুতাঞ্জলির ভূমিকায় তথা উপসংহারে। তারপর—১৯৫১ সালের শেষের দিকে—আমি নিজে শুনতে আরম্ভ করি তাঁর অশরীরী স্বর—দিনের পর দিন। আমাকে তিনি বলতেন (এখনো বলেন প্রত্যহই) কত বিচিত্র কথা—তাঁর জীবনের কত ঘটনা, কত দর্শন, কত উপলব্ধি! সে-সব বলবার স্থান এ নয়। আমি একথার উল্লেখ করলাম শুধু জানাতে কী ভাবে আমি তাঁর জীবনকাহিনীর উপাদান সংগ্রহ করেছি—আমার বহু ভাগ্যেই বলব—কেন না এ-ধরনের দর্শন শ্রবণ আমার সন্দিগ্ধ মন বিশ্বাস করতে বাধা পাওয়া সত্ত্বেও মীরা বহু অকাট্য প্রমাণ দিয়ে আমার স্বভাব-অবিশ্বাসী মনকে করেছেন বিশ্বাসে প্রতিষ্ঠ, যদিও এ বিশ্বাস একদিনে আসে নি—মীরার বহু ভবিষ্যদ্বাণী অক্ষরে অক্ষরে ফলেছে দেখে যেন অনেকটা বাধ্য হ'য়েই তাঁর আবির্ভাবের যাথাতথ্যকে মানতে হয়েছে আমার। তবু কুণ্ঠা হয়—কেনই বা এত কথা বলা—যখন জানি এসব শুনে

অনেকে হাসাহাসি করবেই করবে। উত্তর পেয়েছি অবশেষে : সত্যকে যদি অনেকে অবিশ্বাস করেন তাতে ক্ষতি সত্যের নয় ; ক্ষতি অবিশ্বাসীর। ভুক্তভোগী আমি, তাই জানি—অলৌকিক সাক্ষ্যে বিশ্বাস করা সহজ নয়। কিন্তু সঙ্গে সঙ্গে এও জেনেছি—সানন্দ নৈশ্চিত্যের উপলব্ধিতে—যে, অলৌকিক তরঙ্গে অতিপ্রাকৃত সত্যে যখন বিশ্বাস একবার আসে তখন সে এমনই দৃঢ়মূল হয় যে বহুর অবিশ্বাসে মনে আর দুঃখ ঠাঁই পায় না, কেবল বড়জোর এই আক্ষেপ আসে—"আহা, যারা দেখে নি তারা যদি দেখতে পেত—যদি জানতে পেত কত কী জানা যায় যদি জানতে চাওয়া যায়!" তাই অপরে বিশ্বাস করবে কি না করবে এ-বন্ধ্যা প্রশ্ন ছেড়ে সোজাসুজি ব'লে যাই আমি যা সত্য ব'লে অঙ্গীকার না ক'রে পারি নি।

মীরা আমাকে বলেন যে তিনি দেহান্তের পর কৃষ্ণসাযুজ্য লাভ ক'রেও চেয়েছিলেন সালোক্য বর: অর্থাৎ তাঁর চরণে থেকে তাঁর সেবা তথা রসাস্বাদন করবার অধিকার। অর্থাৎ "চিনি হ'তে চাই না—চিনি খেতে ভালোবাসি"—আর কি! একথা "উত্তরণিকা"য় খানিকটা বলেছি। তবে এর বেশি আর কিছু এখন না বলাই ভালো। যদি মীরা অনুমতি দেন তবে তাঁর সম্বন্ধে আরো অনেক কথাই বলব অকুতোভয়ে—পাঁচজনে বিশ্বাস করবে কি না করবে সে-দুর্ভাবনা ছেড়ে। কারণ মীরার স্পর্শ পাওয়ার পর থেকে এ-বিশ্বাস আমার অচলপ্রতিষ্ঠ হয়েছে যে অদূর ভবিষ্যতে পারমার্থিক অনেক গুহ্য তত্ত্বই অনাবৃত হবে, যেকথা বহুদিন আগে খৃষ্টদেব ব'লে গিয়েছিলেন : "There is nothing covered that shall not be revealed ; neither hid that not be known ."

আজ শুধু এইটুকু ব'লে রাখতে চাই যে মীরা সম্বন্ধে আমি এ-নাটকে যা যা লিখেছি সে-সব মূলতঃ তাঁরই কাছ থেকে পাওয়া—সজাগ অবস্থায় শোনা, দিনের পর দিন। গত বৎসর ১লা অক্টোবর থেকে আজ (২২শে

মে, ১৯৫০) অবধি এমন দিন যায়নি যেদিন তাঁর আবাহন ক'রে আমি সাড়া পাই নি। ইচ্ছা ছিল তাঁর স্বকথিত জীবনকাহিনীর আরো অনেক আশ্চর্য আশ্চর্য উপলব্ধির নাটকীয় রূপ দেবার, কিন্তু মীরা অনুমতি দেন নি। যেটুকু প্রকাশ করবার অনুমতি পেয়েছি সেইটুকুই আমার নাটকের উপজীব্য।

পরিশেষে কেবল আর একটি কথা বলার প্রয়োজন মনে করছি—যদিও সেকথা আমার সদ্যঃপ্রকাশিত "শ্রীচৈতন্য" নাটকের ভূমিকায় বিশদ ক'রে লিখেছি ব'লে এখানে তার শুধু উল্লেখ করেই ক্ষান্ত হব। কথাটা এই যে, নাটক উপন্যাস ঐতিহাসিক হ'লেই যে তার সব কিছুই অক্ষরে অক্ষরে সত্য হ'তে হবে এমন কোনো কথা নেই। সুকুমার সাহিত্যের (belles lettres) স্বধর্ম এক—ইতিহাসের স্বধর্ম আর। তাই এখানে ওখানে আমি অকুণ্ঠেই আমার কল্পনাকে ঠাই দিয়েছি—নাটকের নাটকীয় রস গাঢ় ক'রে তুলতে। ঐতিহাসিক গবেষকদের মধ্যে অনেকে এতে আপত্তি করেন ব'লেই কথাটা বলতে হ'ল। বঙ্কিমচন্দ্র রাজসিংহে এমন অনেক কিছু কল্পনা করেছেন যাকে ঐতিহাসিক সত্য ব'লে অঙ্গীকার করা যায় না। শেক্সপীয়রও তাঁর নানা ঐতিহাসিক নাটকেই নিরঙ্কুশ গতিতে চলেছেন ইতিহাস-মুখাপেক্ষী না হ'য়ে। এতে যাঁরা ভ্রূকুটি করেন সুকুমার সাহিত্য তাঁদের জন্য নয়—তাঁরা যেন ইতিহাস-পঞ্জিকার মধ্যেই স্বাধিকার স্থাপন করেন। অরসিকের কাছে রসের নিবেদন যে কতবড় বিড়ম্বনা সেকথার পরিচয় দিয়ে গেছেন মহাকবি কালিদাস—সে কবে: "অশেষ-দুঃখশতানি বিতরতানি সহে চতুরানন!—অরসিকেষু রসস্য নিবেদনং শিরসি মা লিখ, মা লিখ, মা লিখ।"

এ-নাটকের গানগুলির মধ্যে অধিকাংশই মীরার কাছ-থেকে-পাওয়া: ইন্দিরার কাছে তিনি প্রায় শতাধিক হিন্দি ভজন গেয়েছেন—তার

তর্জমা। কেবল একটি গান—(উত্তরণিকার "সখী সুনরী")—তিনি আমার কাছে আবৃত্তি করেন এ বৎসর নভেম্বর মাসে। এর পরে তিনি আরো সাতটি অপূর্ব গান আবৃত্তি করেছেন যেসব গান আমি লিখে নিয়েছি। সেগুলি যথাকালে স্বরলিপির সঙ্গে প্রকাশ করব।

"সখী শোন ঐ" অনুবাদটি সম্বন্ধে কিছু বলবার আছে। এটি মূল হিন্দি গানের সুরে গেয়। তাই একটু ছন্দের স্বাধীনতা নিতে হয়েছে—অর্থাৎ স্থানে স্থানে গুরু স্বরকে সংস্কৃত বা হিন্দি ভঙ্গিতে দ্বিমাত্রিক ধরা হয়েছে। অর্থাৎ, যেখানে যেখানে তাল পড়ছে সেখানে সেখানে গুরুস্বর দ্বিমাত্রিক। অন্যত্র বিকল্পে। যথা—

॥ ।। ॥। ॥ ।। ॥।। ॥ ॥ ॥ ।। ॥ ॥ ॥

স। খী সুন । বী০ক । হী মুর। লী০ঘ। টা সী । বন্০কে। হৈ ছা। ঈ

স। খী শোন্। ঐ০কো। থায় মুর।লী০মে।ঘের ঘনি। মায়০ প ।রাণ ম না।ছায়

—ইতি।

শ্রীদিলীপকুমার রায়

তর্পণ

শ্রীশ্রীমীরাবাই

উদ্দেশে ঃ

ওগো পারহীনা ! এ-হৃদয়বীণা কী সুরে বাঁধিব সুরের পারে ?
তোমার ছন্দ বাণী চিনিতে-যে আমাদের বোধ মানস হারে !
শিশুকাল হ'তে শুনেছি তোমার অলোক-প্রেমের লোক-কাহিনী,
অচিন্ত্য নীলকান্তের শুধু ঝঙ্কারিল যে মধুরাগিণী !
কোন্ সে-অধরা অমরা হ'তে মা নেমেছিলে তুমি ধরণীতলে—
ভাবি' বিস্ময়ে গিয়েছি হারায়ে কতবার !—কোন্ মন্ত্রবলে
রাজার ঘরণী হ'লে ভিখারিণী কোন্ নীলিমার অভয় লভি' ?
জীবন যাহার রূপকথা-সার মনে হয়—গায় যখন কবি !
অবিশ্বাসের এ-অন্ধকারে হে একান্তিকা, তোমার প্রভা
তারাসম ভায় সংশয়াকাশে—বিমুগ্ধ হ'যে দেখি সে-শোভা !

কহিলে মা তুমি বাণীময়ী, হেসে ঃ "নহি আধুনিকা আমি শ্রীমতী।
যাহা স্রোতে এসে স্রোতে যায় ভেসে—সেথায় আমার নাহি বসতি।
কালের বিশাল রঙ্গমঞ্চে প্রমোদ-প্রদীপ জ্বলিয়া নিভে ঃ
হেন চঞ্চল ঝিকিমিকি-বুকে কে কোথায় কবে দেখেছে শিবে ?
ক্ষণপ্রভা তো নহে অমরণ সত্যতপন কালের নভে ঃ
কালপারে রাজে কালাতীত—সেই চিরন্তনেই বরিতে হবে

বিধবা বসুধা বিহনে তাহার, মিলনে তাহার—সীমন্তিনী,
সনাতন তথা পুনর্নব : এ-দুই রূপে লও তাঁহারে চিনি'।
অতি-আধুনিক ক্ষণতরঙ্গফেনে যারা হয় উধাও সাধে
তাহাদের সেই নির্দিশা ঢেউয়ে কেবল অধীর অবোধে মাতে।
তব বরণীয় ওগো শাশ্বত-পূজারী, কৃষ্ণবরণ-আশা :
তব ধ্যানে—ধ্যেয়, সঙ্গীতে—সুর তাল, সাহিত্যে—ছন্দ ভাষা।
যে-বৃন্দাবন চিরমধুবন যেথা সে বাজায় বঁধুমুরলী,
ডাকে—"আয় আয়" যুগে যুগে, শুনে যে-উদাস সুর সমুচ্ছলি'
ত্যজিয়া স্বজন যশ মান ধন হয় উন্মন অশ্রুরাশী
ধ্রুবসুখ যত দলিয়া হেলায়—তুমি চেয়ো হ'তে সে ব্রজবাসী।
ভুলিও না আধুনিকতার মোহে—জলে-আল্পনা, মেঘের তনু,
মায়াবী যাহার ক্ষণিক বিহার—পল-পরমায়ু ইন্দ্রধনু!
অতি-আধুনিক মালাকর গাঁথে কথার মালিকা উর্ণাডোরে :
ব্যথার একটি ফুৎকারে হয় ছিন্ন সে, যায় কুসুম ঝ'রে।
তুমি চেয়েছিলে কৃষ্ণেরে শুধু, তাই আমি আজ আদেশে তাঁরি
এসেছি তোমার দেখি' ব্যাকুলতা দিতে দিশা—কোথা চির-দিশারি।
অতি-আধুনিক বলে : 'কৃষ্ণ সে অচল মোহর সচল যুগে,
যে জরাজীর্ণ তারে ত্যজি' ধরো নবতনের শ্রীচরণ বুকে।'
শুনিয়া কৃষ্ণ হাসে : যায় যাক যে যেথায় চায় করিতে পূজা :
বিশ্বমানব, কলা, বিজ্ঞান, জাতীয়তা-দেবী লক্ষভুজা।
কৃষ্ণ তো নয় কারো প্রতিযোগী—সহযোগী সে যে নিখিল প্রাণে,
প্রতি কবি ঋষি অবতারের সে পথে ধরে বাতি নিরভিমানে।
হেন সম্রাট্ সর্বসাথীর আশিস-পাথেয় তোমারে দিতে
এসেছি—তোমারে কথামায়া হ'তে উপলব্ধিতে উত্তরিতে।

কথার সহজ পথ ছেড়ে চলো দুর্গম পথে—যেথা শ্রীহরি,
অকূলপাথার হ'তে হবে পার চরণতরণী তাঁহার বরি'।"

ভিখারিণী রাণী! তোমার এ-বাণী শুনেছি শ্রবণে, তাই তো জানি
অযাচিত কৃপা পেল যে তব—সে অকূলপাথারে পাবে পারানি।
তোমার ভাষণ, গান ও জীবন, ব্যথা-অভিসার, তন্ময়তা
দিয়েছে কৃষ্ণপূজার প্রেরণা যারে—সে স্মরিয়া তোমার কথা
প্রার্থে: "তোমার আলোঝঙ্কার যেন ছায় কালো হৃদিগগনে,
কলঙ্ক হার হয় বরে যার—নিয়ে চলো তার চিরচরণে।"

শ্রীঅরবিন্দ আশ্রম
পণ্ডিচেরি

শ্রীদিলীপকুমার রায়

অবতরণিকা

ডুমেল গ্রাম—কাশ্মীর। ঝিলম নদীর তটে স্বামী ব্রহ্মানন্দের যোগাশ্রমে রাধাবল্লভের মন্দিরে দোলপূর্ণিমার রাত্রে সাধক অসিত তার শিষ্যা পদ্মিনীর সামনে ভজনরত। পদ্মিনী পদ্মাসনে আসীন। মন্দিরের মধ্যে চাঁদের আলো। অসিতের দৃষ্টি চন্দ্রনিবদ্ধ।

গান :

নিথর লগনে প্রেমনীলগগনে হেম
চাঁদের খেয়া চলে ভেসে
কেমনে
চাঁদের খেয়া চলে ভেসে।
কোথা বলো পাল তার? কোথা পারী, হাল তার?
ভিড়িবে সে কোন্ পারে এসে?
বলো না,
ভিড়িবে সে কোন্ পারে এসে?

এ-স্বপন-তরণীর হে অলখ নেয়ে!
করুণায় এসো তরী এই পারে বেয়ে
বিনা তব দরশন বল্লভ, তনু মন
আঁখি পিপাসিত এ বিদেশে।
নিশিদিন
আকুল আঁখি দূরদেশে!

আমিও চলেছি আজ কেটে ভববন্ধন,
উধাও দূরভিসারে জপিয়া চিরন্তন,

বিদায় দিয়েছি কালো, পেয়েছি তোমার আলো

এসো নাথ কাছে ভালোবেসে,

অপরূপ !

বাজাও বাঁশরী ভালোবেসে।

উজলি' অন্ধকার এসেছ যেমন আজ,

অন্তর-নিশাপুরে পরিয়া উষার সাজ,

এসো হে তারানিলয় হ'তে চিরচিন্ময় !

আঁধার মায়ার পুরে এসে,

বাসনার

অশ্রু মুছাও বঁধু হেসে।

শুনিতে শুনিতে পদ্মিনী সমাধিস্থ অবস্থায় দেখিল একটি রাজপুতবেশপরিহিতা স্বপ্নদৃষ্টা শ্রীমস্তিনীকে। শ্রীমস্তিনী পদ্মিনীর কাছে আসিয়া তাহার মাথায় হাত রাখিয়া আশীর্বাদ করিলেন।

পদ্মিনী

(শিহরিয়া)

অঙ্গে অঙ্গে ছায় একী অনামা আনন্দ-শিহরণ !

শতধারে উচ্ছ্বসিত সে-প্রবাহ শিরায় শিরায় আবেশের

জাগায় এ-কোন্ দোল ! শান্তি নামে অঝোর আসারে

প্রতি রক্তবিন্দুমাঝে অপরূপ জাগায়ে কাঁপন !

কল্যাণীর রূপে তুমি এলে কোন্ অধরা দেবিকা ?

মনে হয় যেন চিনি···বহুপরিচিতা যেন তুমি···

বেসেছি তোমারে ভালো জন্মে জন্মে যুগে যুগে যেন !···

কেবল শুধাই : কোন্ অর্ঘে বলো তুষিব তোমারে ?

বরিব কেমনে হেন অসম্ভবে সম্ভবের সম ?
সিন্ধুরে বরিতে বিন্দু পারে কভু গণিয়া আত্মীয় ?
মূর্তি তব মানবীর—তবু তুমি নহ তো মানবী !
প্রতি অঙ্গে তব আলো—প্রতি কণিকায় সমুচ্ছল
এক অনুপম দিব্য লাবণ্যের জাগর-জোয়ার !
অপার্থিব এ-সৌন্দর্য বিরাজিত আমাদের এই
রূপ-রেখা-বর্ণ-গন্ধ-ব্যথা-অশ্রুময় জগতের
তত উর্ধ্বে—উর্ধ্বে যত পূর্ণচন্দ্র পর্বতশৃঙ্গের ।
হাসিরে তোমার আছে ঘেরি' এক জ্যোতির মণ্ডল
দেখে নাই যারে কভু নরনেত্র মানবী-অধরে ।
আভাময় স্বর্ণোজ্জ্বল ললাট তোমার বিচ্ছুরায়
শুভ্র অনলের কোটি শিখার লহরী—সে-ময়ূখ
নয় বস্তুসার—তবু প্রত্যক্ষ বাস্তব বিশ্বসম ।
অতনু তনুর তব স্ফটিক-অমল আচ্ছাদনী
পারে না রাখিতে যেন লুকায়ে আন্তর জ্যোতি তার ।
গতি তব ছন্দান্বিত প্রতি ঠামে অপরূপ—যার
আছে দোলা—নাই ধ্বনি ! জানি না এ-কোন্ আবির্ভাব,
স্পর্শ যার পশে মর্মে—নবনীর বুকে পশে যথা
অবলীলাক্রমে তীক্ষ্ণ শায়ক ! মিনতি করি—বলো :
কেমনে পলকে হেন অলোক আনন্দ মা, আমার
বিছাল এ-দেহাধারে চিরাত্মীয় সম—যে-পুলকে
আছিল আমার যেন জন্মস্বত্ব অবিসংবাদিত !
স্বপ্ন এ কি ? না না—কভু নয় । তবু পুছি—ভিক্ষুকেরে
কে সে দিল উপহার অযাচিত রত্নসিংহাসন ?

কে মণিমুকুট দিল পরায়ে অবোধ শিশুশিরে ?
বলো হে মহিমময়ী ! কে তুমি স্বাগতা ? কে বা আমি—
নির্বাক্ বিস্ময়ে হেরি তব আলোকিত অভ্যুদয় ?
আমার কি তুমি দেবী স্বকপোলকল্পিতা প্রতিমা—
অলীক লালিমারাগ—সোনার হরিণ—স্বপ্নছবি ?
অথবা গঠিতা তুমি সত্যই তারকা-জ্যোতিঃসারে ?
আনন্দ-নন্দিনী তুমি কি চিন্ময়ী—অথবা মায়ার
ক্ষণিকস্ফুরৎলীলা—আকস্মিক ? আমি যে জানি না
আমি শুধু জানি—আমি আছি···না না—কারে বলি "আমি" ?
নামরূপ আছে কি আমার ? বলো—পারি না নির্ণিতে।
যে-আমি তোমারে দেখি—সাক্ষ্যমূল্য আছে কি মা তার ?
না না—এ কী চিন্তা ? এলে অনিন্দিতা অলোকসম্ভবা
আমার নয়নলোকে ধরি' কৃপাঘন মূর্তি—তবু
অবিশ্বাস ? ধিক্—যবে প্রতি রক্তকণার স্পন্দনে
তোমার জীবন্ত সত্য উরিল অন্তরে ?—জানি যবে
আমাব আনন্দ-স্ফূর্ত উদ্বেলিত দীপ্ত ধ্রুববোধে—
আবির্ভাব তব হেন সত্যে অঙ্গীকৃত—নাই যার
উপমা এ-বস্তুবিশ্বে কোনো নিঃসংশয় অভ্যুদয়ে—
জানি যবে—গূঢ়তম পুলক কি বেদনারো চেয়ে
সত্য তুমি ! হায়, চিরলক্ষ্য আমাদের—সঙ্গতির
—ক্ষণলীন ক্ষীণসাক্ষ্য ! দেখিয়াও তোমারে মা তাই
করে প্রশ্ন বুঝি মূঢ় মন—নহ ব্যথিতা তো তুমি
সুষুপ্তির গর্ভ হ'তে ? নহ তো আল্পনা কল্পনার—
রূপতরে ধরে কায়া যে-ছায়াপ্রসূতি রঙ্গময়ী

মায়ার এ-লীলালোকে ?—নহ তো দৈবের জলস্রোতে
ভেসে-আসা ক্ষণিকের বুদ্বুদ-বিলাস—নাহি যার
সার্থকতা, গতিলক্ষ্য ? অথবা হয়ত আমি আজ
হয়েছি ডুবারি এক নিঃসংবিৎ তমিস্রা-পাথারে
নাই যেথা উষাদিশা—আছে শুধু রহস্যের নিশা !
—কে করিবে মোচন এ-সংশয়ের গ্রন্থি তোমা বিনা ?

শ্রীমন্ত্রিনী

(স্মিতহাস্যে)

যে-জগৎ হ'তে আমি ব্যথিতা—নহে সে কল্পনার
অলীক, রঙিন লীলা নাই যার প্রতিষ্ঠা, আসন।
নহি আমি ঝটিকার অব্ধিবুকে এক খেয়ালীর
অর্থহীন ঢেউ লভে প্রতি পদে জন্ম যে—কেবল
প্রবাহিয়া অহেতুক ফেনপুঞ্জ হ'তে পরক্ষণে
লীন সে-অনামী অম্বুধির গর্ভে—করিয়া উৎক্ষেপ
বাতুল আবর্ত—যার গর্জমান কল্লোল-বিক্ষোভ
তথা পরবর্তী শান্তি উদ্‌ভ্রান্তির সম প্রতিভাতে।
মর্ত্যালোকে নাম যার ইন্দ্রিয়বোধের ধ্রুব জ্ঞান
অমর্ত্য বোধির লোকে নাম তার স্ফুরৎ-নশ্বর
ছায়ানৃত্য। উপহাস করে যারে যুক্তির জগৎ
কল্পনার রঙ্গ বলি'—তুরীয় সম্বিৎলোকে তারি
ভিত্তি 'পরে বিনির্মিত "অস্তি"-র আনন্দ-রাজধানী :
চেতনা তাহার নাম—সে-ই আদি-অন্তহীন মহা
র-উৎস ত্রিকালের—অতীত, ভবিষ্য, বর্তমান।

ছায়াভ অস্থির সম প্রতিভাতে যারা মর্ত্য পটে—
চিন্ময় সংজ্ঞার লোকে নিত্য হয় প্রতিভাত তারা
নির্বিচল সত্যরূপে—সমুদ্রপ্রচ্ছন্ন শৈল সম
না দেখি' যাহারে পোত হয় ধ্বংস অভিঘাতে তার।
কিন্তু যাক যুক্তির ব্যাখ্যান। আমি এসেছি আজিকে
করিতে তোমার জ্ঞাননেত্র উন্মীলিত—উন্মোচিতে
সে-নিগূঢ় আদিতত্ত্বে যেথা হ'তে উদ্ভব তোমার।
প্রশ্নবাণে জর্জরিত করিয়ো না মনপ্রাণ তব :
করো অঙ্গীকার যাহা এসেছি করিতে আমি দান।
তিনটি আলেখ্য তব নেত্রে আজ উঠিবে ফুটিয়া
তিনটি জন্মের—বিনা সেই সেতুবন্ধ যাহা গাঁথে
যোগসূত্র-সুসঙ্গতি। যে-চেতনা-আলোকে তপন
চন্দ্র তারা দৃশ্যমান—তার বহু উর্ধ্বে রাজে এক
শাশ্বত বিজ্ঞান সাক্ষী সম—যার প্রসাদে প্রকাশ
হয় প্রাণলোকে অনির্বচনীয় ঈশ্বরী আকৃতি।
সেই অতিমানসের বাণীবাহ হ'য়ে ধ্যানে তব
আবির্ভূতা আমি আজ শ্রীকৃষ্ণের করুণা-নির্দেশে।

(পদ্মিনীকে আলিঙ্গন করিয়া)

চাহনি সংলগ্ন তব কর বৎসে, নয়নে আমার।
শ্লথ করো আপনার মানস-প্রয়াস—যাহা আমি
এসেছি করিতে প্রদর্শন—করো বরণ তাহারে
সরল বিশ্বাসে তথা সহজ শ্রদ্ধায়। বর্তমান
পড়ুক খসিয়া ছিন্ন অঙ্গবস্ত্র সম। দেখ চাহি'

অতীতের ছবি যাহা লুপ্ত হ'য়ে তবু উপ্ত রাজে
প্রতি রেখা বর্ণ সাথে চির-জাগরূক শাশ্বতের
স্মৃতিপটে ম্লানিহীন।

পদ্মিনী

যাহা যায় চ'লে একবার
আসে কি না আর ফিরে? বর্তমান প্রতি ঢেউয়ে তার
হয় না কি অতীতের গহ্বরে বিলীন চিরতরে?

শ্রীমস্তিনী

কভু নয়। শাশ্বতের পরম বিকাশে নয় নয়
কিছুই নশ্বর ভবে। ব্যাপ্ত নীহারিকা হ'তে ম্লান
ধূলিকণা সমস্নেহে করেন লালন চিরন্তনী।
প্রতি রেণুমাঝে যবে বিরাজিত অক্ষত অসীম
ক্ষয় কোথা পাবে ঠাঁই? প্রলয়ে যাহার সংহরণ
নবকল্পে উপাদান সেই রচে নবজন্মে তার।
দেখ চাহি'—আকস্মিক বুকে রাজে কেমনে অশেষ

মন্ত্রমুগ্ধা পদ্মিনী শ্রীমস্তিনীর পানে স্থির প্রেক্ষণে চাহিয়া রহিলেন।...ধীরে ধীরে শ্রীমস্তিনী অন্তর্হিত হইলেন ও তাঁহার স্থলে আবির্ভূতা হইলেন এক জ্যোতির্ময়ী তুষার-শিখরাসীনা সমাধিস্থা সাধিকা। তাঁর শুভ্র আলুলায়িত কেশে শুভ্র তুষার অবিশ্রান্ত ঝরিতেছে।

পদ্মিনী

(শিহরিয়া)

কে তুমি মা অনিন্দিতা ? প্রশান্ত আনন তব ঘেরি'
এ-কোন্ জ্যোতির মালা ইন্দ্রনীল আলো-অক্ষে-গাঁথা !
বৈদেহী দেহধারিণী…এত কাছে…তবু এত দূরে…
পর্বতশিখরাসীনা রাকা সম যেন…প্রসারিলে
কর বুঝি যায় ধরা…কোমল কুসুমকলি সম
অথচ মর্মর সম দুর্ভেদ্য নির্মল !

নবোদিতা শুধু হাসিলেন। অদৃশ্যা শ্রীমন্ত্রিনীর স্বর শ্রুত হয় :

পুণ্য নাম
দেবী অনসূয়া—সহধর্মিণী অত্রির, মনোজাত
যিনি স্বয়ম্ভুর – ঋষি, উদ্গাতা বৈদিক ঋঙ্মন্ত্রের।
মানবীর ছদ্মবেশে আসিয়াছিলেন নারায়ণী
সতীশিরোমণি—মর্ত্যে ধারয়িত্রী অমর্ত্য সত্যের।
অনাহত জ্যোতি তাঁর একদা এ-ম্লান অমালোকে
হ'য়েছিল অবতীর্ণ ত্রেতাযুগে—আজো যে-বৈদেহী
প্রেরণা প্রভার সম উপজায় প্রতি সতীহৃদে
এ দুর্গত কলিযুগে—স্পর্শমণি-আশীর্বাদে যাঁর
রূপান্তরিত হয় কাম প্রেমে ! তাঁহার মহতী
কীর্তির কাহিনী এক করিব বর্ণনা।

(আকাশে সদ্য-উদিত ধ্রুবতারার দিকে চাহিয়া)

স্বর্গলোকে

একদা দেবসভায় করিতেছিলেন দেবগণ
জল্পনা—কে সত্য তথা সতীত্বের শ্রেষ্ঠ পূজারিণী
ত্রিভুবনে। সর্বশেষে বলিলেন নারদ হাসিয়া:
"বৃথা এ-বিতণ্ডা। নাই স্বর্গলোকে হেন মহাসতী
সতীত্বে ও সত্যে যিনি তুল্যা দেবী শ্রীঅনসূয়ার—
অত্রির ঘরণীরূপে তপোরতা যিনি মর্ত্যভূমে।"
শুনিয়া স্বয়ম্ভূ, বিষ্ণু, শিব ধরি' ব্রাহ্মণের বেশ
করিলেন কুতূহলে শ্রীঅত্রির কুটীরে প্রয়াণ।
ব্রাহ্মণ অতিথি দেখি' পাদ্য-অর্ঘ্য করি' দান দেবী
কহিলেন: "মহাভাগ! মহর্ষি মানসসরোবরে।
কেমনে করিবে দীনা সমাদর ভবাদৃশ জনে?"
কহিলেন চতুর্মুখ: "শুনেছি আমরা দেবী, তব
সত্যনিষ্ঠা তথা সতীত্বের খ্যাতি আশৈশব। আজ
লভিতে প্রত্যক্ষ পরিচয় তার এসেছি আমরা
যাচিতে আতিথ্য তব। চাই প্রতিশ্রুতি তব পাশে:
দিবে তুমি সেই দান যার তরে বহুদূর হ'তে
এসেছি তোমার দ্বারে।" কহিলেন সারল্য-প্রতিমা:
"বহুভাগ্যে যে পেয়েছে হেন জ্যোতির্ময় ত্রি-অতিথি
পারে সে-কৃতজ্ঞা শুধু বলিতে নমিযা শ্রীচরণে:
যা আছে আমার—যদি পায় সেবা-অধিকার হেন
অতিথির—করো প্রভু আদেশ আমারে শুধু আজ—
হব ধন্য লভি সেই বাঞ্ছিত দুর্লভ অধিকার।"
কহিলেন চতুর্ভুজ: "দেবী! শুধু একটি প্রার্থনা:

করিবে পরিবেষণ স্বকরে আহার্য আমাদের
বিবসনা হ'য়ে—চাই দেখিতে তোমার অপরূপ
দেহকান্তি অনিমেষে আমরা ক্ষুধিত ত্রয়ী আজ।"
লজ্জায় রক্তিম দেবী ঊর্ধ্বমুখে প্রার্থিলেন গাঢ়
আবেগবিহ্বল কণ্ঠে : "কেন হেন পরীক্ষা নিষ্ঠুর—
জানি না বুঝি না আমি পতিদেব! অতিথির বেশে
পশিল আমার গৃহে—কোন্ পাপে জানি না আমার—
এ-হেন কামুক লজ্জাহীন তিন মূর্তি। আমি হায়
অজ্ঞান—কী জানি বলো? শুধু জানি তোমারেই নাথ
আর জানি : যে-অনন্যা জানে শুধু পতিরেই তার
সর্বদেবময় গুরু—নাহি তার লাঞ্ছনা কোথাও।
তাই করি এ-প্রার্থনা হে বল্লভ, যদি এ-জীবনে
আমি শুধু চেয়ে থাকি একনিষ্ঠা তোমারেই স্বামী,
যদি তোমা বিনা কোনো দেবতারো দ্বারে কভু আমি
না চাহিয়া থাকি বর অথবা প্রসাদকণা—যদি
শুধু তব শ্রীচরণ ক'রে থাকি ধ্যান—শুধু চাহি'
ঠাঁই নাথ, সেই তীর্থ হ'তে তীর্থে সত্যব্রতা সতী :
তবে অগতির গতি, করো এসে লজ্জানিবারণ
প্রতিজ্ঞা না করি' ভঙ্গ সতীত্বের হোক সংরক্ষণ।
আমার প্রার্থনা তাই : হোক এই কামুকত্রয়ীর
রূপান্তর শিশুরূপে।

পদ্মিনী

ধন্য, ধন্য ! বলো আরো বলো !
পূরিল কি সে-প্রার্থনা ?

শ্রীমন্তিনী

মহীয়সী সত্যের সাধিকা
দেবীর তপস্যাশক্তি দুর্নিরোধ্য। তিনটি অতিথি
তনুর সঙ্কোচে পলে ধরিলেন তিনটি শিশুর
মানবক কান্তি—পরে করিলেন দেবী নগ্নদেহে
তাহাদের দুগ্ধদান।

পদ্মিনী

(সাশ্রুনেত্রে)

বলো দেবী, বলো—অসম্ভব
হয় কি সম্ভব কভু ? কিম্বা শুধু শিক্ষা দান তরে
রচিলে এ-রূপকথা—সতীত্বের কীর্তিতে মহিমা ?

শ্রীমন্তিনী

কারে বলো অসম্ভব—সম্ভব কাহারে ? যাহা দেখ
প্রতিদিন—না দেখিলে মনে কভু হ'ত কি সম্ভব ?
কোথায় সুদূর সূর্য—কোথায় মৃত্তিকাগর্ভে বীজ !
তবু শুধু রবিবরে বীজে ফলে শস্য প্রাণদাতা।

অজাত শিশুর তরে দুগ্ধ উপজায় মাতৃস্তনে।
জলকণা সংঘর্ষেও ঝলকে বিদ্যুৎ। অণু-ভ্রূণে
জন্ম লভি' গর্ভকোষে বর্ধমান ঋষি, অবতার।
শৈশবে যে অসহায় যৌবনে যে কোটির আশ্রয়।

(স্মিতহাস্যে)

সত্যের নির্ণয় নহে সহজ সুলভ। মূঢ় মন
যুক্তির বিচারে তবু চায় হায় সত্যদিশা! যদি
চাও সত্য জ্ঞান—তব অন্তরের প্রার্থনা-মুকুরে
করো দৃষ্টিপাত—যেথা শাশ্বত সত্যের প্রতিভাস
চিরোজ্জ্বল। দেখ চাহি' উন্মীলিয়া নেত্র—তব পানে
আনত-লোচনা দেবী অনসূয়া। প্রণমি' তাঁহারে
লহ তাঁর শুভাশিস—জীবনের পরম পাথেয়।

পদ্মিনী অনসূয়াকে প্রণাম করিতে তিনি স্মিতহাস্যে তাহাকে আশীর্বাদ করিলেন। ক্ষণপরে অনসূয়া ধীরে ধীরে অন্তর্হিত হইলেন ও তাঁহার স্থলে ফুটিয়া উঠিল এক পরমসুন্দরী শীততন্ময়া নীলবসনা :

বলো, আমি যে কেমন—বলি কেমনে প্রভু?
বলি কেমনে বলো না আমি সেকথা?

আমি দীপাধার, তুমি—দীপশিখা উজ্জ্বল
আমি পল্লব, তুমি—নীল ফুল্ল কমল,
শুধু তোমারি রঙ্গে প্রভু, আমি বিহ্বল,
বলো আর কী বলিব—আমি কেমন, প্রভু?
আমি জানি না তো আর কোনো বারতা।

গানের এক একটি চরণের সঙ্গে ষোড়শীর দেহ হইতে একটি ছুটি করিয়া সখী নিঃসৃত

হইতে লাগিল। এতক্ষণে আট দশটি সখী দৃশ্যমান হইয়া ষোড়শীকে বেড়িয়া নাচিতে লাগিল। ষোডশীর সঙ্গে তাহারাও গাহিতে লাগিল :

তুমি প্রেম-জলধর, আমি—তোমার ছায়া,
তুমি আমার পরাণ, আমি—তোমার কায়া—

এমন সময়ে মুরলীবদন মদনমোহন আবির্ভূত হইলে ষোডশী তাঁহার পাশে দাঁড়াইলেন। গোপীসখীগণ সোল্লাসে উভয়কে বেড়িয়া রাসমণ্ডল রচনা করিল ও গাহিতে লাগিল শ্রীকৃষ্ণের বাঁশরীনূপুর নৃত্যের তালে তালে :

প্রভু, তোমার নিখিল লীলা—আমি যে মায়া,
তুমি তুমি সব—আমি নই কিছুই প্রভু,
আর কী বলিব আমি শরণাগতা ?

গাহিতে গাহিতে এক এক করিয়া সখীগণ ষোড়শীর দেহমধ্যে পুনর্লীন হইলেন। তখন শুধু ষোডশী কৃষ্ণের সম্মুখে নতজানু হইয়া গাহিতে লাগিলেন :

তুমি চন্দ্র নিশায়, আমি—অন্ধ আঁধার,
তুমি কান্ত, সেবিকা আমি মন্ত্র পূজার,
আমি যেমনি হই না বঁধু, রব' হে তোমার,
আমি আর যে কী—জানি না তো, বলো না প্রভু !
রাধা শুধায় চরণে চির-প্রণতা।

পদ্মিনী

(সোচ্ছ্বাসে)

রাধারাণী ! দেবী ! আমি স্বপ্নে কি মা দেখি নি তোমারে ?

শ্রীমস্তিনীর স্বর শ্রুত :

জানি—বহু পুণ্যফলে তব ভাগ্যবতী ! শ্রীরাধিকা
কৃষ্ণশক্তি আত্মহারা প্রতিমা পরম প্রণয়ের

কৃষ্ণ যাঁরে নির্মিলেন প্রেমঘন জ্যোতির নির্যাসে
কৃষ্ণকৃপা-বিলাসিনী প্রতি হিয়া বরে যাঁর হয়
হ্লাদিনী রাধিকাহিয়া—দুর্লভ দর্শনবর তাঁর।

পদ্মিনী মুগ্ধনেত্রে চাহিয়া রহিল। রাধারাণী বারবার গাহিতে লাগিলেন গানের শেষ স্তবক :

তুমি চন্দ্র নিশায়, আমি—অন্ধ আঁধার,
তুমি কান্ত, সেবিকা আমি—মন্ত্র পূজার,
আমি যেমনি হই না বঁধু, রব' হে তোমার,
আমি আর যে কী—জানি না তো, বলো না প্রভু,
রাধা শুধায় চরণে চির-প্রণতা।

গাহিতে গাহিতে রাধারাণী কৃষ্ণহৃদে লীন হইলেন ও তাঁহার স্থানে পুনরাবির্ভূতা হইলেন শ্রীমন্তিনী—গীততন্ময়া :

এসেছি পূজার তরে পূজারিণী হরিগুণগানের আসনখানি পাতিতে।
মনোমন্দির-দ্বার খোল্ তোর—আমি আজ এসেছি বঁধুর প্রীতি সাধিতে।

কুঁড়ি হতে সুখহাসি, নদী হ'তে ছন্দ, বসন্ত অনিল হ'তে হরিয়া,
চাঁদ হ'তে চন্দন, কাজল রজনী হ'তে, তিলক তারকা হ'তে পরিয়া,
ভুজবন্ধনমালা পরায়ে শ্রীকান্তের চরণে এসেছি তারে বাঁধিতে,
অন্তরদীপে আজ হরির প্রেমের জ্যোতিসুন্দর শিখরাগ রাধিতে।

বেসেছি জনম-জনমান্তরে তারে ভালো, জীবনে মরণে সে-ই বন্ধু।
আমি—বীণাযন্ত্র, সে—সঙ্গীতঝঙ্কার, তরঙ্গ আমি, সে-ই সিন্ধু।
প্রিয়তমে তনুমন সঁপিয়া অবগাহন তারি মাঝে এসেছি গো চাহিতে :
মীরার চিরন্তন শোনো প্রেমবন্দন—এলো সে আবার যারে গাহিতে।

পদ্মিনী

(আনন্দাশ্রুনেত্রে)

এতক্ষণে দিলে ধরা ! তুমি—তুমি প্রাতঃস্মরণীয়া
রাজবালা মীরা—

মীরা

(বাধা দিয়া)

নহে : ভিখারিণী কৃষ্ণবিলাসিনী
কৃষ্ণ যার চিরকান্ত—ধ্যান জ্ঞান বৈভব বেদনা ।

পদ্মিনী

(সাগ্রহে)

বলো তবে, বলো মাগো, অতুলন কাহিনী তোমার ।
বাল্য হ'তে দিনে দিনে শুনেছি তোমার কথা কত
অপার বিস্ময়ে—অশ্রু-বেদনা-পুলকে উচ্ছ্বসিয়া !
শুধু তুমি, শুধু তুমি অয়ি ধন্যা কৃষ্ণসোহাগিনী
হয়েছিলে দুরাশিনী হ'তে কৃষ্ণপ্রেমলীলাসাথী ।
চরণকিঙ্কিণীরূপে রণি' পরে রাজ্যবিরাগিণী
মুকুটের মধ্যমণিরূপে তাঁর শোভিলে চূড়ায় ।
অনসূয়া রাধামাঝে লভি' জন্ম পরে তোমামাঝে
প্রমূর্তিল—সে-কাহিনী আজ তুমি দেখালে অতুল
চিত্রের বিন্যাসে এ কী ! কোটিজন্ম-সুকৃতির ফলে

পেয়েছি আশিস তব—যে-তুমি এ ক্লিন্ন কলিযুগে
বিস্ফুরিয়া বিরচিলে অপরূপ কামগন্ধহীন
নবকৃষ্ণপ্রেমকাব্য—দেখায়ে যে মর্ত্য মানবীর
সাধ্য যাহা অসাধ্য দেবীরো—কৃষ্ণপ্রেম-সাধনায়
কৃষ্ণাঙ্কশায়িনী-পদলাভ চিরতরে মর্ত্যদেহে।
কৃষ্ণলীনচিত্তা অয়ি ধন্যা নারীশিরোমণি! ত্যজি'
রাজ্য ধন পিতা মাতা স্বজন বল্লভ সর্বসুখ
কে পারে মা হ'য়ে হেন ভিখারিণী রচিতে প্রেমের
অসাধ্যসাধনবাণী? কে বলে দুঃখিনী নারীজাতি
যবে তুমি অভ্যুদিতা হ'য়ে নারীকুলে প্রেমে তব
করিলে তাহারে পূজ্যা মহীয়সী শুধু প্রেমযোগে?
বলো বলো বলো দেবী, যা কিছু সাধিয়াছিলে তুমি!

মীরা

আমার সাধনা পূজা স্বপ্ন আরাধনা শুধু তুই:
কৃষ্ণ তথা প্রেম। আমি আর কিছু চাহিনি সাধিতে।

পদ্মিনী

এ-সাধনাপারে আছে আর কিছু কি মা সাধনীয়?

মীরা

(প্রসন্না)

জ্ঞান-জিজ্ঞাসার তুমি লভিয়াছ বৎসে অধিকার।
তাই তো এসেছি আমি আজ তব পাশে পুণ্যবতী

বর্ণিতে আমার প্রেম-ইতিহাস—যে-গভীর প্রেম
হয়েছিল অঙ্কুরিত রাজবালা মীরার শৈশবে
কৃষ্ণবিগ্রহের প্রাণপ্রতিষ্ঠায়, সহজ বিকাশ
হয়েছিল যার—অচিন্ত্য অতিথি সাথে দৈনন্দিন
কলহমিলনময় সাহচর্যে। পরে, দিনে দিনে,
ধীরে ধীরে, জানি' তার খেলার সাথীরে বিশ্বপতি,
বাসি' সে তাঁহারে ভালো পেয়েছিল প্রেম-স্পর্শমণি
পাবক সান্নিধ্যে যার তার সর্ব মর্ত্য মলিনতা
হয়েছিল স্বর্ণশুভ্র মায়ামানবের ইন্দ্রজালে।
রাজার দুলালী হয়ে শ্যামনামে ভিখারিণী শ্যামা,
জীবনতুফানে গণি' অনন্য প্রীতিরে ধ্রুবতারা
পেয়েছিল যে পারানি জীবনের অকূল পাথারে,
বরি' শুধু এক ধ্যান : পীতাম্বর, মুরলীমোহন,
বরি' শুধু এক পাঠ : কৃষ্ণনাম সর্ববেদসার,
বরি' শুধু এক রাগ : কৃষ্ণগীতি সাম হ'তে সাম,
বরি' শুধু এক মন্ত্র : কৃষ্ণ নীড় প্রাণবিহঙ্গের,
অনলে অনিলে ব্যোমে সূর্যে চন্দ্রে ছায়াপথে তিনি
প্রতি পান্থ দুরাশার আদি তথা অন্তিম সাধনা॥

ভিখারিণী রাজকন্যা

প্রথম অঙ্ক

প্রথম দৃশ্য

স্থান—রাজপুতানার অন্তর্গত মাড়োয়ারে কুরথি রাজ্যের অধিপতি রাও রাজা রতন সিং-এর প্রাসাদ-সংলগ্ন উদ্যান।

কাল—হেমন্তের অপরাহ্ণ। আকাশে অস্তরাগরঞ্জিত খণ্ড খণ্ড মেঘ উধাও অলস গমনে। যবনিকা উঠিলে দেখা যায় সুদর্শন রণবীর রাজা ও তাঁর সুন্দরী মহিষী—চন্দ্রাদেবী—বাগানের বটগাছে-সংলগ্ন দোলনায় দুলিতে দুলিতে একদৃষ্টে দেখিতেছেন অদূরে রাজ-পরিবারের বালকবালিকাদের খেলাধুলা। আজ মীরার জন্মদিনোৎসব। এ বৎসরের নেত্রী, অর্থাৎ শিক্ষাদাত্রী, মীরা নিজে। রাত্রে রাসনৃত্য অভিনয় হইবে তাহার মহলা চলিতেছে। বৃত্তাকারে-বিন্যস্ত অনেকগুলি ফোয়ারার জল অস্তসূর্যের রাঙা আলোয় ঝিকমিক করিতেছে। ফোয়ারাগুলির কেন্দ্রে একটি গোল মর্মরবেদিকা। সচরাচর ইহার উপর রাত্রে বৃত্তাকারে দীপমালা স্থাপিত হয়। কিন্তু মীরার আদেশে দীপ এখনো রাখা হয় নাই কারণ মীরা অবিলম্বে সেখানে দাঁড়াইবে। আপাতত মীরা বালকবালিকাদের একটি গান শিখাইতেছে ফোয়ারাবৃত্তের বাহিরে। প্রতি চরণ সে একবার করিয়া গায় ও তাহারা দোয়ার দেয়:

প্রভু,　দিনের শেষে ছায়ার রেশে প্রার্থনা জাগে:
আমার　ধূপুক জীবন শিখার মতন তোমারি রাগে।
হোক　সুর আমার কীর্তনঝঙ্কার, প্রাণ—প্রেমের সিংহাসন,
ভাব,　কল্পনা, সুখ, জল্পনা হোক তোমারি সাধন।

রাজারাণী মুগ্ধনেত্রে দেখিতেছেন আদরিণী সপ্তবর্ষীয়া মীরাকে, শুনিতেছেন তাহার কিন্নরীকণ্ঠের গান। সহসা উদ্যানপালক তাঁহাদের কাছে আসিয়া কানে কানে কি কহিতেই উভয়ে শশব্যস্তে উদ্যানের তোরণ অভিমুখে চলিলেন। রাজা স্বহস্তে দুয়ার খুলিতেই গৈরিক আলখেল্লাপরা রাজগুরু দিব্যকান্তি শ্রীমৎ সনাতন গোস্বামী প্রবেশ করিলেন। উভয়ে তাঁহাকে সাষ্টাঙ্গে প্রণিপাত করিলে সনাতন দম্পতীর শির-স্পর্শ করিয়া আশীর্বাদ করিলেন। পরে সনাতন রাজা ও রাণীর সঙ্গে আসিলেন দোলনার কাছে। একটি প্রতিহারী ছুটিয়া আসিল সতরঞ্চ হস্তে। রাজা ও রাণী সনাতনকে দোলনায় বসাইলে প্রতিহারী দোলনার পাদমূলে সতরঞ্চটি বিছাইল ও রাজদম্পতী সে আসনে বসিলেন। সনাতন শিশু-শিষ্যার পানে চাহিয়া স্নিগ্ধ হাসিলেন। পরক্ষণেই তিনি সব ভুলিয়া মুগ্ধনেত্রে দেখিতে লাগিলেন অস্তসূর্যকিরণে রাঙা পরমাসুন্দরী রাজবালা মীরাকে—শুনিতে লাগিলেন তাহার গান শেখানো :

রব' তোমার আশায় সান্ধ্য ছায়ায় বন্ধু পথ চেয়ে।
বাঁশি সাধবে যবে—আসতে হবে অন্তরে ছেয়ে ॥
আমি ডাকব তোমায় প্রথম উষায় বল্লভ, উছলি'।
আমার আসবে হিয়ায় আলোক-মেলায় স্বপন সফলি' ॥

গানটি শেষ হইতেই মীরা—(সনাতনকে সে আদৌ লক্ষ্য করে নাই)—ফোয়ারাবৃত্তের কেন্দ্রস্থ মর্মরবেদীর উপর একলাফে উঠিয়া দাঁড়াইল। বালকবালিকারা অর্ধচন্দ্রাকারে প্রতীক্ষমাণ ভঙ্গিতে দাঁড়াইয়া—ফোয়ারাগুলির ঠিক বাহিরে।

মীরা (তর্জনী সঞ্চালন করিয়া) : এবার শোনো আমার কথা একমনে। একটি কথা নয়—একেবারে চুপ্। আমি এখন শেখাব—ও কী ? প্রভা ! ফে—র ? বলি নি চুপ করতে—অবাধ্য মেয়ে !

প্রভা (সপ্তবর্ষীয়া—রাগতঃ) : আর তুমি ? তুমি বুঝি শান্ত-শিষ্ট লক্ষ্মী মেয়ে—যে কেবল আমাদের শাসাতে আছো !

কমল (অষ্টবর্ষীয়—মীরার অনুরাগীদের দলে) : থাম্ থাম্। মেজাজ দেখাতে হবে না। যার পায়ের ক'ড়ে আঙুলের সমান নোস্

তার উপর চোপা ? মুরদ তো জানা সবারই—কেবল ঝগড়া করতেই আছিস। মীরা! তুমি এ-অপদার্থদের কথায় কান দিও না—শেখাও আমাদের আর একটি গান—সেই গানটি যেটি সেদিন রাজপুরোহিত তোমাকে শেখাচ্ছিলেন। আমাদের চালিয়ে নিতে তুমি ছাড়া আর কে আছে ?

প্রভা (অগ্নিশর্মা) : বটেই তো! ভেড়ারা আবার কবে চলে নিজের বুদ্ধিতে ?

কমল (পিঠ পিঠ) : মরি মরি! কী সিংহীরই দেখা মিলল গো! তা-ও যদি একটু গর্জন করবারও শক্তি থাকত—ব্যা ব্যা করা ছেড়ে।

প্রভা (জ্বলিয়া) : আস্পর্ধা! মাকে দিচ্ছি ব'লে—

কমল (মুখ ভেংচাইয়া) : যা যাঃ—যা পারিস কর গে। তোর দৌড় জানে সবাই—কেউ কান দিলে তো তোর চুকলি-কাটায়! বেরো!

মীরা (বাধা দিয়া) : ছি কমল! বাড়াবাড়ি করে না।

কমল : বাড়াবাড়ি ? আমি আরো কত কী বলতে পারতাম, অথচ বলি নি, তার খবর রাখো ? (প্রভার দিকে চাহিয়া) যা—ছিঁচকাদুনে—যা মার কাছে। মা তোকে চেনেন খুব ভালো ক'রেই—যে হাঁ ক'রে ঘুমোয়—

প্রভা (চিৎকার করিয়া) : মিথ্যুক—মিথ্যুক—

পৃথ্বী (অষ্টবর্ষীয়—মীরার ভক্ত) : মিথ্যুক ? তুই ঘুমোস না হাঁ ক'রে ? আরো কত গুণ—ম'রে যাই। মনে নেই পরশু দিন কী কাণ্ড বাধিয়েছিলি—বেহায়া মেয়ে! নন্দিনীর সঙ্গে চুলোচুলিতে না পেরে খিমচে জিৎলি কালো বেড়াল! উনি আবার মুখ তুলে কথা কন!

নন্দিনী (সপ্তবর্ষীয়া—সন্ত্রস্ত) : আহা—যা হ'য়ে গেছে তা নিয়ে আবার কেন মিথ্যে মিথ্যে—না মীরা! ওদের কথায় কান দিও না—

আমাদের শিখিয়ে যাও। (তার পরে) এ—ই! চুপ্। চুপ্—সবাই। মীরা আমাদের শেখাবে আর একটি গান।

মীরা (গম্ভীর): না। আমি জোর করতে চাই না। প্রভা যদি শিখতে না চায়—বেশ তো—যাক চ'লে। আমি শুধু চাই তাদের যারা চায় শিখতে।

পৃথ্বী: এই তো মীরার মতন কথা। যে চায় শিখতে আসুক মাথা নিচু ক'রে। যে না চায়—যাক্ বেরিয়ে। আমরা শিখতে চাই মীরার কাছে—কে কে চায়?—হাত তোলো।

প্রভা ছাড়া সকলেই হাত তুলিল

কমল: বেশ। তবে প্রভা! তুই দূর হ—এক্ষুনি।

প্রভা (কাঁদিয়া): দূর হ তুই তুই তুই—লক্ষ্মীছাড়া! (চিৎকার করিয়া) ও মা—গো! দেখ না—

মীরা (কোমল কণ্ঠে): ছি প্রভা! কাঁদে? সবাই কী বলবে বলো তো? শোনো, লক্ষ্মী মেয়ে হ'য়ে—আমি যা শেখাতে যাচ্ছি শিখলে তোমার মন খুশি হ'য়ে যাবে। আমি যা শেখাতে যাচ্ছি—আমার স্বপ্নে-পাওয়া।

নলিনী (নববর্ষীয়া): স্বপ্নে-পাওয়া? কী? গান? না, নাচ? (হাততালি দিয়া) আমরা শিখ্‌ব শিখ্‌ব শিখ্‌ব।

মীরা: শ্—শ্—শ্। শোনো সবাই। আমি স্বপ্নে দেখেছি রাধাকে—

নন্দিনা (সোল্লাসে): বা বা বা! কৃষ্ণের রাধা?

পৃথ্বী: নয় তো কি করিমচাচার? গাধা কোথাকার!

নন্দিনী (সানুযোগে): দেখ না মীরা—

মীরা (অধীর) : দেখ, এই বলছি শেষবার—তোমরা যদি ঝগড়া করো তবে আমি আর কক্ষনো কিছু শেখাব না।

পৃথ্বী (সভয়ে) : না না মীরা! এই মুখে চাবি। আর যদি কখনো কিছু বলি! বলো তুমি—দেখলে তুমি রাধাকে? সত্যি?

মীরা (সগর্বে) : আমাকে কেউ মিথ্যা বলতে শুনেছে কোনোদিন? (তারস্বরে) শোনো সবাই মন দিযে! রাধাকে দেখলাম দাঁড়িয়ে আছেন প্রথমে ত্রিভঙ্গ হ'য়ে—ঠিক কৃষ্ণের মতন—মুখে হাসি হাতে বাঁশি—

কমল : কিন্তু কই বাঁশি?

মীরা (তৎক্ষণাৎ—পঞ্চবর্ষীয়া রমাকে) : রমা! লক্ষ্মী মেয়ে! যা না ভাই, আমার ঘরে সেই বাঁশিটা—

রমা সোৎসাহে ছুটিয়া রাজপ্রাসাদের অভিমুখে নিষ্ক্রান্ত

মীরা : যতক্ষণ বাঁশিটা না আসে ততক্ষণ দাঁড়াতে শেখাই—কে শিখবে? কে হবে রাধা?

নন্দিনী : আমি—আমি।

মীরা : বেশ। তাহ'লে দেখ আগে আমার পায়ের দিকে চেয়ে। এই ভাবে দাঁড়িয়েছিলেন রাধা—এই ডান পা-টা না?—হ্যাঁ এই ভাবে বাঁ পা-র সামনে বেঁকিয়ে—না না ও তো দুম্‌ড়ে গেল—কী জ্বালা! কোনোদিন কি দেখো নি ছবিতে? চোখ দুটো কি মুখ সাজানো?

কমল : আমি জানি। এই দেখ মীরা—

কমলের পা একটু বেশি বাঁকিয়া গেল—সঙ্গে সঙ্গে

নন্দিনী : হা—হা—হা—

প্রভা : ম'রে যাই! একেবারে স-ঙ্‌!

নলিনী : এবার প'ড়ে যাবি পা মচ্‌কে—

কমল (সপদদাপে) : থাম্। কিছু করবার বেলায় মুখ শুকিয়ে আম্‌শি—কেবল টিট্‌কিরি দিতেই আছেন—গাধার দল!

মীরা (বাধা দিয়া) : দেখ কমল! এ-রকম করলে আমি এক্ষুনি চ'লে যাব।

কমল (তটস্থ) : না না মীরা! ভুলে, ভুলে। আর যদি একটিও কথা কই। বলো—কী বলছিলে।

মীরা (তর্জনী সঞ্চালন করিয়া) : কিন্তু:মনে থাকে যেন! (পর পর অনেকের দিকে চাহিয়া) এবার শোনো সবাই চুপটি ক'রে। রাধা—কে হবে? হ্যাঁ হ্যাঁ—নন্দিনী। শোনো নন্দিনী! এইভাবে দাঁড়াও আগে সোজা হ'য়ে। রাধা প্রথমে সোজা হ'য়ে দাঁড়াবেন, পরে ত্রিভঙ্গ। আর কৃষ্ণ—কৃষ্ণ কে! কমল? বেশ। তুমি কৃষ্ণ হ'য়ে নন্দিনীর সামনে বসবে হাঁটু গেড়ে। এটুকু তো পারবে?

রত্না (দশবর্ষীয়া—গম্ভীরভাবে) : কিন্তু কী বলছিস তুই মীরা? কৃষ্ণ কি মেয়েছেলে যে হাঁটু গেড়ে মাথা নিচু করবে? কমলের সামনে হাঁটু গাড়ুক নন্দিনী—কারণ সে মেয়ে।

মীরা (সপদদাপে—ক্রুদ্ধকণ্ঠে) : সব চুপ্। একেবারে চুপ্।

সবাই সভয়ে নিশ্চুপ

মীরা : ফের যদি কেউ কেউ যা মুখে আসে তাই বলে তবে পাবে সাজা। (অবজ্ঞাভরে) আর যত রাজ্যের বাজে বুলি! কী? না, মেয়েরাই হাঁটু গাড়বে ছেলেদের কাছে! লজ্জায় মাথা কাটা যায় না একথা বলতে—শুনতে? যেন মেয়েরা বানের জলে ভেসে এসেছে! আর কৃষ্ণ কী এমন পীর শুনি যে সাক্ষাৎ রাধা ঠাকরুণের কাছে হাঁটু গাড়তে তাঁর মাথা হেঁট? তাছাড়া এ আমার মনগড়া কথা নয়—আমি

স্বচক্ষে দেখেছি কৃষ্ণকে রাধার সামনে শুধু হাঁটু গাড়তে নয়—হাতজোড় পর্যন্ত করতে। কই কমল? হাঁটু গাড়বে নন্দিনীর সাম্‌নে—না আমি আর কোনো কৃষ্ণকে তলব করব?

কমল (আহত): বারে বা! অন্যে করবে তম্বি তোমার ওপর—আর তুমি শোধ তুলবে আমার ওপব!—যারা তোমাব নামে চুকলি কাটে সদাসর্বদা—(হাস্যবতা নন্দিনী, প্রভা ও নলিনীকে) হাসি থামাবি তোবা—না ও দাঁত ক'পাটি দেব এক ঘুঁষিতে—

মীরা (রুষ্ট): এ অসহ্য। আমি এবার—

এমন সময়ে বাঁশি হাতে ছুটিযা রমার অভ্যুদয। মীরা বাঁশি দেখিবামাত্র সব ভুলিয়া সানন্দে হাততালি দিল—সবাই চুপ করিয়া চাহিল তার দিকে উৎসুকনেত্রে

মীরা: ছুড়ে দে আমাকে—আমি লুপে নেব।

রমা (খুশি): ধরো—এক, দুই, তি—ন—

মীরা (উৎক্ষিপ্ত বাঁশিটি লুপিয়া লইয়া): এইবার ঠিক জমবে আসর। শোনো সবাই মন দিয়ে—আমি নিজেই সব আগে রাধা হ'য়ে বাঁশি বাজাব—

প্রভা: কিন্তু রাধা বাঁশি বাজাতে পারতেন কি?

মীরা: কী ক'রে জানলে, পারতেন না?

প্রভা: কী ক'রে জানলাম? বাঃ। কেউ শুনেছে কোনোদিনও যে রাধা বাঁশি বাজিয়েছেন? আছে কোনো পুরাণে লেখা?

মীরা: রাধা তাঁর হাতের পায়ের নোখ কাটতেন—লেখা আছে কি কোনো পুরাণে?—কিন্তু মরুক গে। বাজে তর্কে কান দেবার সময় আমার নেই। আমি মানি না শাস্ত্র পুরাণ—যা ভালো বুঝি তাই করি। আমার চাই সেই রাধাকে যিনি পারেন নাচতে, গাইতে,

বাজাতে। তাছাড়া আমি যদি বাঁশি বাজাতে পারি রাধা পারবেন না কেন শুনি?

বলিয়াই মীরা বাঁশিতে একটি সরল সুন্দর সুর বাজাইতে সুরু করিল। অমনি
মুহূর্তে সব কলরব থামিয়া গেল—সকলে মুগ্ধবৎ শুনিতে লাগিল।
সনাতনের চক্ষে আনন্দাশ্রু ঝিকমিক করিয়া উঠিল, তিনি
একদৃষ্টে দেখিতে ও শুনিতে লাগিলেন মীরার
তন্ময় হইয়া বাঁশি-বাজানো

চন্দ্রা (মাতৃগর্বে): বলুন গুরুদেব, মেয়ে আমার নয় কি ছবি?

সনাতন (অর্ধস্বগত): ইয়ং গেহে লক্ষ্মীরিয়মমৃতবর্তির্নয়নয়োঃ। (চন্দ্রাকে) কী সহজ সুরজ্ঞান! তোমার মেয়ে তো মা?

চন্দ্রা (গর্বিত কণ্ঠে): হাঁ গুরুদেব! চার বছর বয়সেই মীরা গাইতে পারত—কী সুন্দর যে!

সনাতন: বটে? আজ এই আটে পা দিল—ওর জন্মদিনে? ওর নাচও দেখবার ম'ত।

সনাতন (হাসিয়া): দেখছি তাহ'লে রূপে লক্ষ্মী গুণে সরস্বতী। আহা, কী সুন্দর তান দিচ্ছে বাঁশিতে! জয় গুরু!

রতন সিং (পরিহাসের স্বরে): মা আমার রূপে লক্ষ্মী মানতেই হবে। কেবল যদি সময়ে সময়ে ওর উপর ভর না করতেন দুষ্টু সরস্বতী!

চন্দ্রা (অসহিষ্ণু): কী যে বলো তুমি—সবার সামনে! ছেলে-মানুষ হবে না চঞ্চল? না গুরুদেব! আপনি কারুর কথায় কান দেবেন না। মা আমার এসেছেন আমার কোলে মা-লক্ষ্মীরই কৃপায়। আমি স্বপ্নে দেখেছিলাম তাঁকে আট বছর আগে। তিনি আমাকে বলেছিলেন: "আমি তোর গর্ভে আসব মা!" এই আপনার পা ছুঁয়ে বলছি গুরুদেব—একটুও যদি বাড়ানো হয়—

সনাতন (ব্যস্ত হইয়া) : জানি মা জানি, আমি দেখবামাত্র ক্ষণজন্মা মাকে আমার চিনেছি।

চন্দ্রা : আপনার মুখে ফুল চন্দন পড়ুক, গুরুদেব। কেবল আশীর্বাদ করুন ওর জন্মদিনে—যেন ও আমার মাথায় যত চুল তত বৎসর বেঁচে থাকে ও দুঃখ না পায় কোনোদিন!

সনাতন : সাক্ষাৎ লক্ষ্মীর বরে যাকে কোলে পেলে, তাকে আশীর্বাদ করতে যাবে কোন্ মানুষ মা ?

চন্দ্রা : তা হোক—তবু। (রতন সিংকে) ওকে ডাক দাও—গুরুদেবের আশীর্বাদ চাইই চাই আলোয় আলোয়।

রতন সিং : বটেই তো। (উঠিয়া দাঁড়াইয়া তারস্বরে) মীরা! ও মীরা! একবার এদিকে আসবে মা ?

মীরা স্বর শুনিয়া চমকিয়া পিতার দিকে চাহিতেই টাল সাম্‌লাইতে না পারিয়া নিচে গোলাকার জলাধারের মধ্যে ফোয়ারা-সঞ্চিত জলে পড়িয়া গেল। সবাই চিৎকার করিয়া উঠিল। কমল লাফাইয়া মীরার হাত ধরিতেই মীরা এক লাফে জলাধার হইতে বাহির হইয়া বাহিরের ঘাসের উপর আসিয়া পড়িল। ওদিকে সনাতন রাজা ও রাণীর অনুসরণ করিযা দ্রুতপদে মীরার দিকে অগ্রসর হইলেন। বালকবালিকাসহ মীরা ছুটিয়া আসিতে মাঝপথে যোগ হইল উভয় দলের।

চন্দ্রা (মীরাকে জড়াইয়া ধরিয়া) : মা মা মাগো, লাগে নি তো বেশি ?

মীরা (নিজেকে ছাড়াইয়া হেলাভরে) : দুর! লাগতে যাবে কেন ?

চন্দ্রা : ঐ যে (মন্দিরের দিকে তাকাইয়া) ও মা! রক্ত!—

মীরা : হুঁঃ! কোথায় রক্ত ? একটু ছ'ড়ে গেছে বৈ তো না।

রতন সিং (পরীক্ষা করিয়া) : ভাগ্যিস এইটুকুর উপর দিয়ে গেছে।—যাক গে—শোনো মা, গুরুদেব এসেছেন তোমাকে আশীর্বাদ

করতে। প্রণাম করো। এঁর মতন সাধুপুরুষ ভূভারতে বিরল। কেবল ব'লে রাখছি—যদি দুষ্টু মেয়ে হও তবে উনি আশীর্বাদ করবেন না।

মীরা (সনাতনকে প্রণাম করিয়া ফুল্লকণ্ঠে): কিন্তু আমি কি দুষ্টু মেয়ে?

সনাতন: কে বলে শুনি? (অন্য ছেলেমেয়েদের দিকে তাকাইয়া) বলো তোমাদের মধ্যে কে কে আমার মা-র নামে দুষ্টু অপবাদ রটায়। আমি লড়ব তাদেব সঙ্গে আজ—লাগে—!

আস্তিন গুটাইয়া তাল ঠুকিলেন সশব্দে

মীরা (খিল খিল করিয়া হাসিয়া): তবে বাবা যে বললেন আপনি এসেছেন আশীর্বাদ করতে?

সনাতন (স্নিগ্ধকণ্ঠে): মা, তোমাকে আশীর্বাদ করতে পারেন শুধু (আকাশের দিকে দেখাইয়া) যিনি ঐখানে ব'সে—ঠাকুর। মানুষ তোমাকে দিতে পারে শুধু অর্ঘ।

মীরা (বুঝিতে না পারিয়া): কী বললেন?

সনাতন: কিছু না মা। শোনো। তোমার কাছে আমি এসেছি তোমাকে আশীর্বাদ করতে না—এসেছি একটি উপহার দিতে—ঠাকুরের আদেশে।

মীরা (হাততালি দিয়া): আপনি ভা—রি লক্ষ্মী! বা বা বা! কী উপহার? বলুন—দেখান—এক্ষনি।

সনাতন (হাসিয়া): এইমাত্র রাধা সাজতে চাইছিলে না? কিন্তু রাধা সাজতে হ'লে শুধু বাঁশি বাজালেই চলবে না—শিখতে হবে আর একটি জিনিস—ধৈর্য ধরতে। না মা—মুখ ভার কোরো না। বলি

নি—আমি এসেছি উপদেশ দিতে না, উপহার দিতে। রোসো। (বলিয়া ঝুলির ভিতর হইতে বালগোপালের একটি একহস্ত পরিমিত শুভ্র মর্মরবিগ্রহ বাহির করিয়া) এই নাও মা—আমার নিজের ঠাকুর-ঘরের ঠাকুরকে দিলাম সঁপে তোমার হাতে।

মীরা (চমকিয়া) : এ কী! এ-মূর্তি যে আমি দেখেছি—কালই রাতে!

চন্দ্রা : সে কি মা? কোথায়?

মীরা : স্বপ্নে। ঠিক এই ঠাকুর—অবিকল—এই রকম শাদা পাথরের। দেখলাম—প্রথমে রাধা হাঁটু গেড়ে দাঁড়ালেন ও কেঁদে কেঁদে ডাকতে লাগলেন। অম্নি—কী কাণ্ড মা—এই তোমার গা ছুঁয়ে বলছি—দেখলাম ঠাকুর বেরিয়ে এলেন—একটি পাঁচ বছরের ছেলে—কী সুন্দর যে!

চন্দ্রা : তারপর?

মীরা : তারপর কী যেন হ'ল? হ্যাঁ দেখলাম—(মুখ ঢাকিয়া) ও মাগো!

চন্দ্রা : কী দেখলি রে?

মীরা : দেখলাম রাধার জায়গায় আমি দাঁড়িয়ে—আমি! ভাবতে পারো? (সনাতনকে) স্বপ্নের পাগলামি নিশ্চয়। নয়?

সনাতন : কেউ কি জানে মা?

মীরা (সবিস্ময়ে) : "কেউ কি জানে"—মানে?

সনাতন : থাক সে-কথা মা! শোনো যা বলতে আমি আজ এসেছি—যা ঠাকুর আমাকে বলতে বলেছেন তোমাকে। আমি স্বপ্নে পেয়েছিলাম যে তুমি জন্মেছ রাজপুতানার কোনো রাজপরিবারে, কেবল কোন্ রাজ্যে—জানতাম না। পরদিন—বৃন্দাবনে—ঠাকুর আমাকে

বললেন তোমার খোঁজ ক'রে তোমার হাতে এই বিগ্রহটি দিতে। আমি গত তিন মাস ধ'রে তাই তোমাকে খুঁজে বেড়াচ্ছি। আজ তোমাকে দেখতেই বুঝতে পারলাম আমার খোঁজার পালা শেষ। (গাঢ়স্বরে) মা! তুমি জানো না তুমি কে—কিন্তু আমি জানি—কেন না ঠাকুর আমাকে জানিয়ে দিয়েছেন। এর বেশি বলার অধিকার আমায় দেন নি তিনি, তাই শুধু এইটুকু ব'লেই ক্ষান্ত হব যে তোমার মধ্যে দিয়ে ঠাকুর আমার এক নবলীলা দেখাবেন যার তুলনা পাওয়া ভার। মা কন্যাকুমারী! নাও দীন পূজারীর অর্ঘ—আমার ঘরের ঠাকুর, প্রাণের প্রাণ। এতদিন ঠাকুর ছিলেন আমার ভাঙা ঘরে চাঁদের আলো হ'য়ে (অশ্রুরুদ্ধকণ্ঠে) আজ থেকে পাবেন রাজকন্যার হাতের সেবা।

রতন সিং (স্পৃষ্ট): গুরুদেব! ওর বহু ভাগ্য। কিন্তু—যদি অপরাধ না নেন—

সনাতন: কী? থামলে কেন?

চন্দ্রা (ত্বরিত): আপনার এ-অমূল্য উপহারের মর্যাদা দেবার সাধ্য আমাদের যে নেই গুরুদেব! আপনার নিজের বিগ্রহ—প্রাণের প্রাণ। আমরা কোন্ অধিকারে হব ওঁর সেবায়েৎ?

সনাতন (ম্লান হাসিয়া): মা, আমাদের নিজের বলতে কি কিছু আছে এ-জগতে? থাকতে পারে? যা কিছু আমরা পাই—মালিক তিনিই—আমরা দুদিনের অছি বৈ তো নই। তবু মানুষের কাড়া-কাড়ির অন্ত নেই—বেলা ব'য়ে যায় শুধু মিথ্যে "আমার আমার" ক'রে।

বলিতে বলিতে সনাতনের চোখে জল চিকচিক করিয়া উঠিল—তিনি ভাবাবেগে গাহিয়া উঠিলেন:

মন! যা কিছু সব তারি—
শুধু তার—যে পারের পারী।

শুধু তারেই জানিস অকূলে কূল, তুফানে কাণ্ডারী।
কেন মিথ্যে ভোলা, মরিস ভেবে?
যে পাওয়াবার পাইয়ে দেবে:
তুই শুধু জপ কর্ ওরে: "যা দেখি—সব তোমারি।
কবে আমার প্রতি কণা হবে তোমার অভিসারী?
ওগো অকূলে কাণ্ডারী।"
ওরে! বন্ধু যাদের বলিস রে তুই, ভাবিস ভালোবাসে,
বাঁধা তারাও যে রে এম্নি "আমার-আমার" মোহপাশে!
তোকে ভালোবাসে তারা যখন
চায় এই "আমি"-র আশাপূরণ,
যেম্নি তাদের ভাঙবে আশা—হবেই ছাড়াছাড়ি।
তাই শেষ রক্ষা চাস যদি, বল্: স্বজন যে তুই তারি
যার নাম অপারে-পারী।

গাহিতে গাহিতে সনাতনের গণ্ড বাহিয়া অশ্রু ঝরিয়া পড়িল। রতন সিং মুখ ফিরাইয়া অস্তসূর্যের পানে চাহিয়া রহিলেন। চন্দ্রা আঁচলে চোখ মুছিলেন। খানিকক্ষণ নিশ্চুপ। বালকবালিকারা একদৃষ্টে সনাতনের দিকে চাহিয়া।

রতন সিং (সহসা সনাতনকে প্রণাম করিয়া): আশীর্বাদ করুন গুরুদেব—যেন একথা মনে রাখতে পারি।

সনাতন (সকুণ্ঠে): আশীর্বাদ করতে পারেন শুধু ঠাকুর।

মীরা: আপনি ভারি আশ্চর্যি মানুষ কিন্তু। যেমন হাসতে তেমনি কাঁদতে।

সনাতন: ঠাকুরের কাছে আর কিছু শিখি নি মা, শিখেছি শুধু এই দুটি বিদ্যে। কিন্তু সে যাক। আমার যাবার সময় হ'ল। শুধু শেষ কথাটি বলা হয় নি।

একটু থামিয়া অশ্রু-আবেগ দমন করিয়া

মনে রেখো শুধু একটি কথা যে ঠাকুর তোমাব অতিথি হ'তে চেয়েছেন তোমার হাতের সেবা পেতে। ভুলবে না তো ?

মীরা : ভুলব কেন ? কেবল বলবেন আমাকে—আপনার সেবা ছেড়ে আমার সেবা চাইলেন ঠাকুর কী জন্যে ?

সনাতন (জোর করিয়া হাসিয়া) : শোনো নি কি—ঠাকুর আমার স্বভাব-লোভী—বিশেষ ক'রে সুন্দরের।

মীরা : শুনেছি—আমাদের পুরুত ঠাকুরের কাছে। কিন্তু আপনিও তো কিছু কম সুন্দর নন। তবে ?

সনাতন : এ 'তবে'-র জবাব এক তিনিই দিতে পারেন। আমরা কী জানি বলো মা ? আমরা শুধু জানি একটি কথা : যে, তাঁর লীলার হিসেব পাওয়া ভার। কবে যে তিনি কার দিকে ঝোঁকেন কেউ জানে না—তিনি ছাড়া। (মুখে জোর করিয়া হাসি টানিয়া) তাই শুধু এইটুকু বলা যে তাঁকে ভালোবেসে আরো হেসে নাও—বেলা থাকতে।

মীরা (হাসিয়া) : আপনি কী সুন্দর হাসতে পারেন—যখন তখন !

চন্দ্রা : সত্যি ! এমন শিশুর মতন সরল হাসি কেউ দেখে নি কোনোদিনো। কেবল—(সকুণ্ঠে)—অপরাধ নেবেন না গুরুদেব—আপনি কেমন ক'রে পারেন হাসি দিয়ে কান্না ঢাকতে ?

সনাতন (গম্ভীর হইয়া) : মা, ঠাকুরের গুণের অন্ত নেই—কোন্ পথ দিয়ে যে কাকে কোথায় নিয়ে যান—তাই বোধহয় আমাকে শিখিয়েছেন শুধু হাসি দিয়ে কান্না ঢাকতে নয়—আরো অনেক কিছু। তাদের মধ্যে একটি এই যে হাসিও ভালো কান্নাও ভালো যদি পারি তাঁর পায়ে নিবেদন করতে। কারণ ঠাকুর আমার পরশমণি—যা-ই কিছু তাঁকে ছোঁবে হ'য়ে উঠবে নিখাদ সোনা। তাই (গাঢ় কণ্ঠে) তিনি যে আজ আমার কাছছাড়া হ'তে চাইলেন এতে আমার ব্যথা থাকলেও দুঃখ নেই

—কেন না এইটি তিনি আমাকে দেখিয়ে দিয়েছেন যে তাঁর জন্যে যার প্রাণ কাঁদে সে অভাবের মধ্যে দিয়েও পৌছয় ভাবে। (ম্লান হাসিয়া—মীরাকে) মা, ঠাকুর সুখে দুঃখে আমার ভাঙা ঘরে চাঁদের আলো হ'য়েছিলেন আজ পাঁচ বৎসর। এ-পাঁচবছর ধ'রে আমি হাতে পেয়েছি স্বর্গ—প্রতি দিন, প্রতি মুহূর্ত। কেন?—তাঁর ইচ্ছা। আজ তাঁর সেই ইচ্ছায়ই তিনি চাইলেন আমার ঘর ছেড়ে বিরাজ করতে তোমার ঘরে। এতদিন চলেছিলাম তাঁর দিকে দিনের আলোয়—আজ থেকে চলতে হবে রাতের কালোয়। কিন্তু আলোয় যিনি পথ দেখান আঁধারেও তিনিই তো থাকেন হাতটি ধ'রে! দুঃখ তো সত্যি দুঃখ নয়—চাঁদের উল্টো পিঠ।

মীরা : কিন্তু দুঃখ সইবেন কী দুঃখে—যখন ইচ্ছে করলেই সুখ পেতে পারেন? আসুন না, সবাই মিলে তাঁকে নিয়ে আনন্দ করি? আমাদের ম—স্ত বাড়ি। এখানেই থাকুন না—যাবেন কেন?

সনাতন : নরম তোমার প্রাণটি। ঠাকুর আকাশ থেকে আশীর্বাদ করছেন। কিন্তু (দীর্ঘনিশ্বাস চাপিয়া) রাজপ্রাসাদ তো বৈরাগীর জন্যে নয় মা। আমাকে ফিরে যেতেই হবে বৃন্দাবনে—আমার শূন্য ঘরে।

মীরা (দৃঢ় কণ্ঠে) : যেতেই হবে? কেন—ইচ্ছে করলেই পারেন থাকতে!

সনাতন : মানুষের ইচ্ছার সাধ্য কতটুকু মা? শুধু—শুধু সেই ইচ্ছাই সর্বজয়ী যে তাঁর ইচ্ছাকে মেনে চলে।

মীরা (ম্লান কণ্ঠে) : আপনার কথা কিচ্ছু বোঝা যায় না। আপনি ইচ্ছা করুন তো দেখি—দেখি কে আপনাকে টেনে নিয়ে যায়!

সনাতন (উদাস হাসিয়া) : একদিন বুঝবে মা যে, ইচ্ছা করব বললেই ইচ্ছা করা যায় না। আজ শুধু এইটুকু বলি যে, আমাকে ফিরতেই হবে বৃন্দাবনে। গুরুর আদেশ।

মীরা : আদেশ মানে কী? (একটু অপেক্ষা করিয়া) আঃ, বলুন না।

সনাতন : মা, গঙ্গাতীরে যে পৌঁছেছে সে কি আর কুয়োর কাছে হাত পাতে? যা জানতে চাও এখন থেকে সোজা তাঁকে শুধিয়ো— তিনিই জবাব দেবেন।

রতন সিং (বুঝিতে না পারিয়া) : জবাব দেবেন? কে?

সনাতন (বিগ্রহকে দেখাইয়া) : ঠাকুর স্বয়ং।

মীরা : জবাব দেবেন—পাথরের ঠাকুর? কেমন ক'রে?

সনাতন : যদি বলি—যেমন ক'রে আমি তোমার সঙ্গে কথা কইছি?

মীরা (মাথা নাড়িয়া) : বললেই হ'ল? আপনি হ'লেন জীবন্ত—

সনাতন : যদি বলি—ঠাকুর আমার চেয়েও বেশি জীবন্ত?

মীরা (উত্ত্যক্ত স্বরে) : খা—লি "যদি বলি—যদি বলি"! আমিও যদি বলি—আপনার মাথা খারাপ?

{রতন সিং : শ্—শ্—শ্
{চন্দ্রা : মীরা!—ছি মা—!

মীরা : তোমরা কেন এমন করছ সবাই মিলে? (কাঁদ কাঁদ স্বরে) আমি স্বচক্ষে দেখছি (বিগ্রহকে দেখাইয়া) পাথর—তবু তোমরা বলবে জীবন্ত?

চন্দ্রার হাত সহসা টানিয়া আনিয়া বিগ্রহের নাসিকার ঠিক
নিচে তাঁহার তর্জনী ধরিয়া

দেখ তো? নিশ্বেস বইছে কি?

সনাতন (হাসিয়া) : বইবে মা বইবে—তুমি ঠাকুরকে ভালোবাসলেই

—শুধু তাঁর নিশ্বাস বওয়া নয়—তিনি কথা কইবেন তোমার সঙ্গে ঘণ্টার পর ঘণ্টা।

চন্দ্রা : কিন্তু গুরুদেব—

মীরা : রোসো মা! (সনাতনকে) আপনি কী যা তা বলছেন! ভালোবাসলে একটা মরাও কি কোনোদিন বেঁচে উঠেছে—তা ইনি তো গোড়া থেকেই পাথর! (একটু অপেক্ষা করিয়া) আঃ, জবাব দিচ্ছেন না কেন?

সনাতন (মীরার মাথায় হাত রাখিয়া) : জবাব-দেনেওয়ালা যিনি তিনি জবাব দেবার জন্যে মুখিয়ে আছেন ব'লে।

চন্দ্রা : ওর ছেলেমানুষি কথায় কান দেন কেন গুরুদেব? ওকে আশীর্বাদ করুন শুধু।

সনাতন : ওকে আশীর্বাদ করবেন ঠাকুর—যিনি যেচে এসেছেন ওর ঘরে। এমনটি কলিযুগে আর হয় নি মা—(পশ্চিম আকাশের পানে চাহিয়া) ঠাকুর পাটে নেমেছেন—আমার বিদায় নেবার সময় হ'ল।

মীরা (কাঁদ কাঁদ সুরে) : দেব না যেতে। (হাত ধরিয়া) থাকতেই হবে আপনাকে—অন্তত এক মাস।

সনাতন (হেঁট হইয়া মীরার শির চুম্বন করিয়া) : আবদার করে না মা! পারলে কি আমি থাকতাম না তোমার মতন দেবী মা-র কাছে? কিন্তু মহাপ্রভুর আদেশ—বৃন্দাবনেই আমার সাধন ও মরণ। বেলা ব'য়ে যায় মা—আর দেরি করলে চলবে না—(রতন সিংকে) মনে নেই—

(সুর করিয়া)

নলিনীদলগতজলমতিতরলম্
তদ্বজ্জীবনমতিশয়চপলম্।
ক্ষণমিহসজ্জনসঙ্গতিরেকা
ভবতি ভবার্ণবতরণে নৌকা॥

চন্দ্রা (আঁচলে অশ্রু গোপন করিয়া) : যদি যাবেনই ধ'রে রাখব কেমন ক'রে গুরুদেব ? কেবল একটু উপদেশ দিয়েও যাবেন না—কী ভাবে চলব অন্ধ আমরা ?

সনাতন : প্রার্থনা কবো যেন তিনি দৃষ্টিদান করেন। আর কী ?

চন্দ্রা : তবু—?

সনাতন (একটু ভাবিয়া) : একটা কথা বলতে সাধ যায়—যদি অভয় দাও।

চন্দ্রা : সে কি গুরুদেব ! আপনার কথা যে বেদবাক্য।

সনাতন (মৃদু হাসিয়া) : তাহ'লে শোনো মা খাঁটি বেদবাণী : "স মোদতে মোদনীয়ং হি লব্ধ্বা।"—

(সুর করিয়া)

আনন্দময়-মিলন যে পায়
শুধু সেই সুখী বসুন্ধরায়।

তাই বলি (একটু থামিয়া) যদি পারো···এ-মেয়ের বিবাহ দিও না।

চন্দ্রা (শিহরিয়া) : বিবাহ দেব না ? এ কী অলক্ষণা কথা গুরুদেব ?

সনাতন : এর চেয়ে সুলক্ষণা কথা আমি তোমাদেব কাছে কোনোদিন মুখে আনি নি মা। মেয়ে হ'য়ে তোমার গর্ভে কে এসেছে ভুলে গেলে ?

চন্দ্রা (বিরস মুখে) : কিন্তু তাব'লে বিয়ে দেব না মেয়ের—এ কেমন কথা ?

সনাতন (দীর্ঘনিশ্বাস ফেলিয়া) : উপদেশ চেয়েছিলে ব'লেই বলেছি মা।

রতন সিং : গুরুদেব ! অপরাধ নেবেন না—আমার ঐ একটিই মেয়ে—বিয়ে দেব না তার ? কেন ?

সনাতন : দিলে—(একটু থামিয়া) পরিতাপ হবে তোমাদের। কারণ…কারণ—বিবাহ দিলে এ-মেয়ে সুখী হবে না।

চন্দ্রা (কাঁদ কাঁদ সুরে) : কেন এমন নিদারুণ কথা বলছেন গুরুদেব?

সনাতন : বলছি জানি ব'লেই মা! কারণ…কারণ যে একবার—(বিগ্রহকে দেখাইয়া) ঠাকুরকে ভালোবেসেছে সে আর কাউকে ভালোবাসতে পারে না এ-জীবনে।

সবাই নিশ্চুপ

চন্দ্রা : যদি আপনাকে যেতেই হয় তবে আর দেবি না-করাই ভালো। আলো থাকতে থাকতে—

সনাতন (সচকিত) : হ্যাঁ মা। এই যাই। আমার অনেক আগেই বিদায় নেওয়া উচিত ছিল। (মীরাকে) চলি মা লক্ষ্মী! মনে রেখো যা বললাম। রাখবে তো?

মীরা (সাষ্টাঙ্গে প্রণিপাত করিয়া) : রাখব।

সনাতন (মীরার মাথায় হাত রাখিয়া সুর করিয়া) :

রাধা মধুরা মালা মধুরা
মথুরাধিপতেরখিলং মধুরম্।
মীরা মধুরা লীলা মধুরা
মথুরাধিপতেরখিলং মধুরম্॥

মা লক্ষ্মী! এবার উঠে ঠাকুরকে কোল দাও।

মীরা (উঠিয়া বিগ্রহকে কোলে তুলিয়া লইয়া সাশ্রুনেত্রে) : কিন্তু আপনার সঙ্গে কি আব দেখা হবে না?

সনাতন : হবে মা!

মীরা : কবে? কোথায়?

সনাতন : ঠাকুরই ব'লে দেবেন—যথাকালে।

দ্বিতীয় দৃশ্য

আট বৎসর পরে।   মীরা এখন পঞ্চদশী।

স্থান—কুরখির রাজপ্রাসাদে মীরার সুরম্য কক্ষ। ঘরের এক কোণে
একটি মর্মরবেদিকায় মীরার বালগোপাল, বিগ্রহ অবস্থিত।
পাশে একটি সুন্দর মখমলাস্তৃত পালঙ্ক। কাল—সন্ধ্যা।
ঘরে ঝাড়লণ্ঠন জ্বলিতেছে।

মীরা বিগ্রহের সামনে কয়েকটি ধূপ জ্বালাইয়া গায়:

মরি, মধুবনে কোন্ ভুবনমোহন উজলি' আঁধার এলো!
ছিল জীবনের বীণা ঝঙ্কারহীনা—কে বাঁধিতে তার এলো!
শিরে শিখিচূড়া, গলে মালা,
দুটি আঁখিতে আবেশ-ঢালা,
যার রূপে অধরাও আলা—সে মোহিতে মানস ধরার এলো!
শুনি' রাগিণী যাহার রাধা
পথে জিনিল কাঁটার বাধা,
যার প্রেমে হয় প্রেম সাধা—সে দিশারি প্রেমের দিশার এলো!
প্রাণে মীরার বিছায়ে নন্দন,
আশা কোকিলে শিখায়ে বন্দন,
সে কি চিরসাধের চিরন্তন জ্যোতি জ্বালাতে অপার এলো!

গাহিতে গাহিতে মীরা নৃত্য সুরু করিল।…গানান্তে বিগ্রহের সামনে প্রণাম
করিয়া উঠিয়া চোখ খুলিতেই দেখে—সামনে দাঁড়াইয়া হাসিমুখে
কিশোর কৃষ্ণ—পঞ্চদশবর্ষীয় বালক।

মীরা (সাভিমানে): এতদিন পরে মনে পড়ল?

কৃষ্ণ (সবিস্ময়ে): এতদিন! মানে? এই তো পরশু সকালেই-

মীরা : তারপরে দুটো দিন, দুটো রাত কেটে গেছে। তবু মুখ তুলে কথা কইছ ?

কৃষ্ণ : এ তোমার অন্যায় মীরা ! আমার বুঝি আর কারুর সঙ্গে খেলতে ইচ্ছে করে না ?

মীরা (রুষ্ট) : তবে যাও তাদেরি কাছে—যদি মনে করো তারা তোমাকে মীরার চেয়ে বেশি ভালোবাসে।

কৃষ্ণ : এ ভালোবাসাবাসির কথা নয়। মানুষ বড় হবার সঙ্গে সঙ্গে বৈচিত্র্য চায় না বুঝি ?

মীরা : বা রে ওজর ! অথচ আমাকে বলা হয়—যেন শুধু তোমাকে ছাড়া আর কাউকে না চাই ! মৌমাছির জন্যে সঞ্চয়ের ব্যবস্থা : ফুল বেচারির জন্যে—সব হারিয়ে ঝ'রে যাওয়ার ! চমৎকার !!

কৃষ্ণ (হাসিয়া) : কী জ্বালা ! ফুলের স্বধর্ম—মধু বিলোনো, মৌমাছির—মধু জমানো।

মীরা (মুখ ভার) : বেশ তো গো ! তবে যাও না সেই অঞ্চলে যেখানে মধু বাড়তি—আমার এখানে যখন ঘাটতি।

কৃষ্ণ : এর পরে বোধহয় রাগ করবে এই ব'লে যে, ফুল বেচারি যখন ঘুরে ফিরে বেড়াতে পারে না—তখন মৌমাছিকে কেন পাখা দেওয়া হ'ল ওড়বার জন্যে ? মেয়ে হ'লে কি অবুঝ হ'তেই হবে ?

মীরা : অবুঝ মেয়েরা ? আর ছেলেরা ?

কৃষ্ণ : ছেলেরা কী করল ?

মীরা : কী না করেছে তাই বলো। মধুও নেবেন শুষে আবার রাগ করবেন মধু যে দিল তার ওপর—কেন তার মধু বিলোলে ফুরিয়ে যায় !

কৃষ্ণ : কী বিপদেই পড়েছি ! যুক্তি যখন হার মানে তখন উপমার

টুঁ! ফুলের যে জন্মই মধু বিলিয়ে ঝ'রে যেতে, মৌমাছির জন্ম মধু পুঁজি ক'রে মৌচাক গড়তে। এখানে রাগ করবে কে কার ওপরে?

মীরা : রাগ? রাগ করে কি মানুষ পাষাণের ওপরে? তোমার যুক্তির পসরা নিয়ে যাও অন্য হাটে ঠাকুর। আমাকে ছেড়ে দাও। (অশ্রুরুদ্ধ কণ্ঠে) আমি চাই ওঁর সঙ্গ যার স্বাদ পেয়ে আর সব স্বাদ গেছে আমার কাছে পান্‌শে হ'য়ে—আর উনি ফাঁদবেন খাসা খাসা যুক্তির জাল। যেন যাকে বঞ্চিত করা হয় তার মন মানে যুক্তির প্রবোধ!

কৃষ্ণ : বোঝা যাবে গো রাজকন্যে, কে কাকে বঞ্চিত করছে—যেদিন শাঁক বাজবে, তুবড়ি ছুটবে, হাউই উড়বে—সেদিন বোঝা যাবে কার স্বাদ পান্‌শে লাগে কার কাছে। আর বেশি দেরিও নেই—এলো ব'লে রাজপুত্তুর সোনার কাঠি হাতে।

মীরা : এলো ব'লে! আচ্ছা গোপাল! মিথ্যে কথা বলতে কি তোমার একটুও বাধে না?

কৃষ্ণ : মিথ্যে? রাও রাজা তোমার সম্বন্ধ করছেন না মেবারের রাণার সঙ্গে?

মীরা : শুধু যুক্তিজাল নয়, তার ওপব আবার বাক্যবাণ! কিন্তু জিজ্ঞাসা করি—অম্লানবদনে যা মুখে আসে তাই ব'লে যেতে একটুও বাধে না তোমার?—

কৃষ্ণ : ম্লানবদন হ'লেই কি বিয়ে ঠেকানো যেত রাজকন্যের?

মীরা : আচ্ছা, একটা সোজা প্রশ্নের সোজা জবাব দেবে তুমি?

কৃষ্ণ : কী প্রশ্ন?

মীরা : তুমি কি জানো না—আমি বিয়ে করব না কোনোদিনই—করতেই পারি না? গুরুদেব বলেন নি কি—আমি বিয়ে করলে অসুখী হব?

কৃষ্ণ : যেন দৈবজ্ঞের সব কথাই ফলে। ধরো, যদি বিয়ে ক'রে

দেখ ফলল না—যদি দেখ তোমার দেহ মন প্রাণ সুখের অথই জলে ডুব সাঁতার কাটছে ?

মীরা : তোমার সঙ্গে আড়ি আড়ি আড়ি।

কৃষ্ণ : বেচারির অপরাধ ?

মীরা : অপরাধ ? মুখ তুলে জিজ্ঞাসা করতে পারলে—যখন বেশ জানো আমার মন ?

কৃষ্ণ : কিন্তু আজকের মন কি কালকে থাকে সব সময়ে ? আমি না মুনিদের মতন দৈবজ্ঞ, না মেয়েদের মতন সর্বজ্ঞ—জানব কী ক'রে শুনি ? না, শোনো মীরা, কেন তুমি এইটুকু বুঝবে না যে তোমার মন অন্য দিকে মোড় নিতেও পারে ? ধরো যদি কোনো কার্তিক পুরুষের দিকে তোমার মন টলে যিনি ধুমধড়াক্কায় ওস্তাদ। তার উপর ধরো যদি তিনি হ'ন সাক্ষাৎ মেবারের মহারাণা—তার ওপর যদি তিনি বলেন তোমাকে একদিন সুধামাখা হাসি হেসে যে তুমিই তাঁর ধ্যান জ্ঞান আরাধনা—তখন দেখা যাবে গো দেখা যাবে—কে কাকে ভোলে ও বলে : "কেমন ? তুলেছি তো শোধ ?"

মীরা : জানা আছে গো জানা আছে : শোধ তোলার প্রশ্ন ওঠে ভালোবাসলে তবে। কিন্তু ভালোবাসা যেখানে একতরফা ?

কৃষ্ণ (হাসিয়া) : সেখানে কি আর অভিমান টোপ ফেলতে যায় সই ? তুমি চাও আমি এবার বলি তোমার কাছে হাঁটু গেড়ে (নতজানু হইয়া করজোড়ে, সুর করিয়া)

তোমারে বাসি না ভালো—সে কী কথা ?
হে পথহারার-ভরসা-দিশা !
ঝর্না গরজি' যত বলে—"যাও",
তৃষিতের হয় গভীর তৃষা।

মীরা (হাসিয়া ঠেলা দিয়া) : কত ঢঙই জানো গোপাল! আর ঐ না হয়েছে আমার জ্বালা—ভাবি রাগ করব—কিন্তু তোমার ঢঙ দেখে যাই ভুলে যে তোমার সবই খেলা—ঠাট্টা।

কৃষ্ণ (শিহরিয়া) : ঠাট্টা? তোমার সঙ্গে ঠাট্টা করব কি না আমি—যে-তুমি রূপে লক্ষ্মী গুণে সরস্বতী—যে-তুমি সাক্ষাৎ রাজকন্যা তার ওপর গম্ভীরা, বিদুষী, প্রতিভাময়ী! যে-তোমার আওতায় এই আট বছর ধ'রে আমি বেড়ে উঠেছি—দিনের পর দিন, বছরের পর বছর? কিন্তু ওগো মেধাবতী! এত বুদ্ধি ধরো, শুধু এইটুকু জানো না যে দিনে দিনে যা খোরাক জোটে তাতে আমরা শুধু বেড়ে উঠি না—বদ্‌লে যাই? তাই কেমন ক'রে তুমি আমাকে বিশ্বাস করাতে চাও শুনি—যে যখন সাক্ষাৎ রাজপুত্তুর এসে তোমাকে আদরে সোহাগে ডুবিয়ে দেবেন তখন তুমি যাবে না বদ্‌লে—বলবে না আমাকে : "তোমার দিন গত ঠাকুর, এবার বিদায় হও"?

মীরা (কাঁদ কাঁদ সুরে) : তা-ই যদি হবার হয়, তবে এখনি বিদায় হও। (অশ্রু দমন করিয়া) এমন কথা উচ্চারণ করতে পারলে? (পিছন ফিরিয়া) আমি আজ থেকে সুরু করব উপবাস—মরব শুকিয়ে। তখন তুমি পাবে সাজা।

কৃষ্ণ (মীরার হাত ধরিয়া টানিয়া) : আহা, ঠাট্টাতে রাগ করলে—

মীরা (হাত ঠেলিয়া) : যাও তুমি। তোমার সঙ্গে আর না। তুমি মীরার ভালোবাসা পাওয়ার যোগ্যই নও।

কৃষ্ণ (সোল্লাসে) : হা হা হা! তবেই দেখ, আমি ঠিকই ধরে-ছিলাম কি না। ইতিমধ্যেই তোমার মনের কোণে উঁকি দিয়েছে এই আশাটি যে, আর-একজন আছেন তোমার পথ চেয়ে যিনি তোমার ভালোবাসার যোগ্য পাত্র। (দীর্ঘনিশ্বাস ফেলিয়া) আর কথাটা তো

সম্পূর্ণ মিথ্যে নয় রাজকন্যে! কোথায় রাজপুত্র রণবীর ভোজরাজ, আর কোথায় সরল, পাড়াগেঁযে গোপাল!

মীরা (সব্যঙ্গে): সরল! বলতে বাধল না শ্রীমুখে?—যখন বেশ জানো আসলে তুমি কী বস্তু—প-য়ে আকার, মূর্ধন্য ষ-য়ে আকার, মূর্ধন্য ণ। (কাঁদিয়া ফেলিয়া) যাও গোপাল—আর সয় না আমার।

কৃষ্ণ (সাদরে): ছি ছি, সাক্ষাৎ রাজকন্যে—এমন ক'রে কাঁদে! (ভুলাইতে) জানো কি—আমার কার কথা মনে পড়ছে আজ?—আর একজন, যিনি ঠিক এম্‌নিই অভিমান করতেন কথায় কথায়—সেই দ্বাপর যুগে। অ—বি—ক—ল!

মীরা (সব ভুলিয়া সকৌতূহলে): কে—কে গোপাল? রাধা?

কৃষ্ণ: শ্রীমতী——স্বয়ং। কিন্তু তিনি যেন তোমার ওপরও এক কাঠি যেতেন—দিতেন শাপমন্যি। একদিনের কথা মনে পড়ে—বলেছিলেন জলভরা চোখে—ঠোঁট কাঁপছে—

(সুর করিয়া)

কী জানে পুরুষ রমণী-হৃদয়—প্রেম যার হৃদি-শ্বাস?
জানিবে যেদিন লভিবে জনম রাধা হ'য়ে শ্রীনিবাস!
শ্যাম রূপে আমি সেদিন বাজাব বাঁশি—তুমি হ'য়ে রাধা
জানিবে আমারে—খুঁজি' ইতি উতি—প্রেম সে কেমন ব্যথা!

মীরা (সৌৎসুক্যে): বলো না গোপাল—শ্রীমতীর কথা। জানো কি—কালই রাত্রে আমি তাঁকে দেখেছি আমার স্বপ্নে?

কৃষ্ণ: হা হতোঽস্মি! তাহ'লে না জানি কী সব তিনি ফাঁশ ক'রে দিয়েছেন আমার সম্বন্ধে! মেয়েরা মেয়েদের কাছে না বলে কী—নারী লজ্জাবতী বলে কোন্ ভুক্তভোগী?

মীরা (অধীর) : তুমি যে কী—! শোনো কী হ'ল। দেখলাম—তাঁর চোখে জল, মুখ ম্লান। বৃন্দাবন শূন্য ক'রে তুমি তো উধাও মথুরায়। রাধার চোখের আলো গেছে কালো হ'য়ে। কিন্তু তিনি কী বললেন শুনবে? অনুযোগ অভিযোগের ধার পাশ দিয়েও গেলেন না—"তুমি শুধু সুখে থাকো"—এই ভাব।

কৃষ্ণ : বটে? আর কী বললেন?

মীরা : একটি কথাও না—শুধু গাইলেন একটি গান—শুনবে?—আমি সকাল থেকেই গাইছিলাম—অবিকল তাঁর গাওয়া সুরে—

(সুর করিয়া)

দেখেছি স্বপনে কাল, সখী, তারে : হাতে ছিল বাঁশি তার,
মুখে আলো-হাসি—প্রতি মন চুরি করে যে চমৎকার!
সে কেমন?—যেন আকাশের চাঁদ ঢলিল এ-বসুধায় :
মথুরার ঘুম ভাঙাতেই যেন এসেছে উছলতায়!

কৃষ্ণ : তবে যে বললে অনুযোগের—

মীরা : আঃ—শোনোই না আগে—

(সুর করিয়া)

তার পরে এ কী? পলকে সে দেখি—হ'ল যেন আনমন!
ভুলে-যাওয়া কারে স্মরি' যেন হরি ভুলিল তিন ভুবন!
"দীরঘনিশাসে কে আসে!"—কহিল মৃদুস্বরে শ্যামরায়।
দেখিয়া বিমনা তারে লো, আঁধার জীবনে আমার ছায়!

কৃষ্ণ : সাবধান রাজকন্যে! এখন থেকেই ব্যথা নিয়ে বিলাস সুরু করলে আখেরে শুধু যন্ত্রণাই হবে কণ্ঠমালা। রাধা দুঃখ পেয়েছিলেন, কেন না···কিন্তু মরুকগে—আমি তোমাকে শুধু বলতে চাই যে আমি

আর যার সুখের পূর্ণিমায়ই অমাবস্যা হ'য়ে এসে থাকি না কেন— তোমার সুখের পথে কাঁটা হ'য়ে থাকব না, থাকব না। এমন কি, আমি রাধার কথার প্রতিধ্বনি ক'রে বলতে পারি অকপটেই—

(সুর করিয়া)

রাখালে যদি বা যাও ভুলে কোনো মহারাণা তরে হায়,
জেনো—সে-রাখাল তব স্মৃতিপট হ'তে লো, লবে বিদায়।

মীরা : যাও তুমি—যাও যাও যাও। তোমার পানে আর যদি একটিবারও ফিরে তাকাই—

কৃষ্ণ : বটেই তো—সূর্য উঠলে কে আর তাকায় ধ্রুবতারার পানে? কিন্তু রাগ রেখে একটু কান দেবে আমার কথায়? যা হ'য়ে গেছে তা নিয়ে তর্কাতর্কি করতে আমি আসি নি আজ, এসেছি— কী হবে সেই নিয়ে দুটো ভালো কথা বলতে (সাদরে মীরার হাত ধরিয়া) যদি অবশ্য কৃপা ক'রে অধীনের কথায় কান দাও করুণাময়ী!

মীরা : সত্যি বলছি গোপাল—কিন্তু না—কী হবে ব'লে যখন দেখি যে রাগ ক'রে তোমাকে মুখেই বলি "যাও"—প্রাণ দেয় না সায় কিছুতেই। যেই তুমি একটু হেসে কথা কও—অমনি বিশ্ব যাই ভুলে! কিন্তু কেন এমন করো তুমি—যখন জানো (কৃষ্ণের কাঁধে মাথা রাখিয়া) যে তুমি যা-ই কেন না আদেশ করো আমি না মেনে পারি না?

কৃষ্ণ (আলিঙ্গন) : জানি গো জানি—তোমার ম'ত লক্ষ্মী মেয়ে কি দুটি আছে ভূভারতে? কাঁদে না—ছি!

মীরা (বিদ্যুদ্বেগে নিজেকে মুক্ত করিয়া) : তুমি আমাকে কী ভেবেছ শুনি? কাঁদব আমি? কেন? কার কাছে? (উদ্গত অশ্রু চকিতে মুছিয়া) কিন্তু তুমি কে গোপাল—বলবে আমাকে? কেন

তোমাকে ভালো না বেসে পারি না—যে-তোমাকে এতদিন দেখেও পারি নি এতটুকু চিনতে ? কেমন ক'রে দেখা দাও তুমি যখন তখন —কোন্ জাদুবলে ?—আমি ছাড়া আর কেউ কেন তোমাকে দেখতে পায় না ?—দিনের পর দিন কেন আসো একটা সামান্য মেয়ের সঙ্গে খেলতে—যে-তুমি শুনি সাক্ষাৎ জগন্নাথ ? অথচ তবু আমার কেন তোমাকে মনে হয় শুধু খেলার সাথী—বন্ধু ? কী তোমার স্বরূপ ? নিষ্প্রাণ বিগ্রহ তুমি—না প্রাণময় অন্তর্যামী ? আজও জানি না তো আমি। শুধু জানি—তুমি যে-ই হও না কেন—মীরার তুমি মাথার মণি, বুকের নিশ্বাস, চোখের আলো। জীবনে তোমার চিহ্নের লেশও নেই —অথচ ভুবনে যা রোজ চাক্ষুষ করি তার চেয়েও তুমি সত্য—হাজার গুণে সত্য। এ কেমন ক'রে হয়—বলবে আমাকে ? না, কোনো ওজর নয়—আজ বলতেই হবে তোমাকে—কেন আমার সঙ্গে খেলছ এ নিষ্ঠুর খেলা ? কী চাও তুমি ? কেন আসো তুমি আমার কাছে ?

কৃষ্ণ : বাঃ ! তা-ও বলতে হবে ?—তোমাকে ভালোবাসি ব'লে।

মীরা : বাসো, না বেসেছিলে—একদিন ?

কৃষ্ণ : আচ্ছা, এমন অবুঝ হ'লে আমি কী করব বলো তো ? কী বলবই বা ? না, শোনো লক্ষ্মীটি ! আজ আমি তোমার কাছে আসি নি কোনো খেলা খেলতে—এসেছি শুধু একটা কথা জিজ্ঞাসা করতে।

মীরা : সে হবে না। আজ আমি চাই তোমাকে জিজ্ঞাসা করতে—আর উত্তর তোমাকে দিতেই হবে।

কৃষ্ণ (অসহায় সুরে) : তবে করো জিজ্ঞাসা। বায়না ধরলে মেয়েদের সঙ্গে কে এঁটে উঠবে বলো ?

মীরা (কৃষ্ণের নেত্রে অচঞ্চল দৃষ্টি রাখিয়া) : কয়েক বছর পেছিয়ে যেতে হবে। শোনো, কথা কোয়ো না। (একটু চুপ করিয়া) মনে পড়ে

সেদিনের কথা—আট বছর আগে—যেদিন তুমি এসেছিলে নিরীহ হ'য়ে—সেই আমার জন্মদিনে?

কৃষ্ণ: বিলক্ষণ!—সে কি ভুলবার? আমি এসেছিলাম শুধু তোমার হ'তে—তুমি চাইলে আমি সেই সঙ্গে সেই সন্নিসি ঠাকুরেরও হই। (হাসিয়া) তবু তিন ভুবনে রটল—ভালোবাসতে তো মেয়েরা!

মীরা (রাগ করিতে হাসিয়া ফেলিয়া): কী করলে যে তোমাকে বাগ মানানো যায় মাঝে মাঝে ভাবি। যতই কেন মনে করি না—তোমার ওপর শোধ তুলব—তোমার হাসির সুর বেজে উঠতে না উঠতে স—ব যাই ভুলে। তবে আমার একটা সাধ আছে—কোনোদিন মিটবে কিনা কে জানে!

কৃষ্ণ: কী—শুনি!

মীরা: যে-ক'রে হোক তোমার চোখে জল দেখি একবার, দেখি—তুমি ভেবে কূলকিনারা পাচ্ছ না। সাধ হয়—আরো কত কিছুর। কিন্তু যেই তুমি এসে নরম সুরে ডাকো—'রাজকন্যে', অম্‌নি কোথায় যে নিরুদ্দেশ হয় আমার পুষে-রাখা পাহাড়-প্রমাণ রাগ ক্ষোভ অভিমান!—

কৃষ্ণ: সাধ্বী, সাধ্বী! কেবল ভয়ে ভয়ে একটা কথা জিজ্ঞাসা করি: এইমাত্র তুমি বলছিলে আমাকে চাও কত কী জিজ্ঞাসা করতে। তবে বোধ হয়—মেয়েলি অভিধানে জিজ্ঞাসার নাম বাক্যবাণ?

মীরা: কী করব! তুমি কাছে আসতে না আসতে যায় আমার খেই হারিয়ে। এক এক সময়ে—যখন মনটা রাগে দুঃখে ফুলে ফুলে ওঠে তখন ভাবি যদি তোমাকে এম্‌নি দুঃখ দিতে পারতাম—কিন্তু অম্‌নি শিউরে উঠি: ছি ছি! এ আমার কোন্‌-দিশি ভালোবাসা যে চায় দুঃখ দিতে? কিন্তু তুমি যে দেখেও দেখ না, শুনেও শোনো না। তাই

হয়তো ভাবো আমি আজও সেই শিশু মীরা আছি যার কাছে তুমি এসেছিলে আট বছর আগে বিগ্রহের ছদ্মবেশে। আমি আজ যাকে বলে অরক্ষণীয়া।

কৃষ্ণ: উঃ! কী দারুণ সব সংস্কৃত কথায় নিরীহ গোবেচারিদের চম্‌কে দিতে চাও তুমি!

মীরা: ঐ—ফের তুমি সুরু করলে!—যেন তুমি জানো না অরক্ষণীয়া বলে কাকে। যেন তোমার কাছে অজানা যে আমার আত্মীয় স্বজন সবাই আজ চাইছে আমাকে ভোজরাজের হাতে সঁপে দিয়ে নিশ্চিন্ত হ'তে। না, শুনতেই হবে তোমাকে। আমি জানি—আমি ঠিক আর পাঁচজনের মতন নই—আমাকে বিধাতা ঢালাই করেছেন একটু অন্য ছাঁচে। আমার ভাই বোন প্রিয় পরিজন কেউ আমাকে বোঝে না—বলে—আমার মাথা খারাপ, নইলে আমি হাওয়ার সঙ্গে হাসি কাঁদি! এমন কি, আমার বাবাও পারেন না আমাকে বিশ্বাস করতে যখন আমি বলি যে তুমি আসো আমার কাছে দিনের পর দিন, কথা কও, খেলা করো, তর্ক ফাঁদো। তাই তো তিনি চান রাতারাতি আমার বিয়ে দিতে —কেন না সবাই বলছে বায়ুগ্রস্তের একমাত্র ওষুধ বিয়ে। (ম্লান হাসিয়া) কিন্তু দুঃখের মধ্যেও হাসতে হয় বৈ কি—যখন দেখি যে তিনি আমাকে পাগল ভাবা সত্ত্বেও যেই আমি তাঁর কাছে গাই তোমার শেখানো কীর্তন অম্‌নি কেঁদে ভাসিয়ে দেন,—বলেন আমাকে "মা কন্যাকুমারী"—দেন আমার পায়ে ফুল চন্দন। কিন্তু তারপরে ফের যেই পাঁচজনে বকাবকি করে অম্‌নি তাদের সুরে সুর মিলিয়ে বলেন—স্বপ্ন নিয়ে ঘর করা কিছু নয়—মেয়েরা হ'ল গৃহলক্ষ্মী, গৃহদেবতা ইত্যাদি। কিন্তু (ঠোঁট ফুলাইয়া) আমি তাঁকে কাল সাফ ব'লে দিয়েছি যে আমি বিবাহ করব না, করব না, করব না—করতে পারি না।

কৃষ্ণ : "করতে পারি না" না ব'লে বলো বরং "করতে চাও না।" কিন্তু কেন চাও না—বলবে আমাকে ?

মীরা : কেন করব—বলবে আমাকে ?

কৃষ্ণ : কেন করবে ? বাঃ—সবাই ক'রে আসছে—সেই মান্ধাতার আমল থেকে—

মীরা : যুক্তির রাজা বটে ! সবাই যা করে তাই করতে হবে প্রত্যেককে ? তুমি নিজে করো ?

কৃষ্ণ : মেয়েলি মাথা বটে ! প্রশ্ন ক'রে জবাব পেতে না পেতে ধরবে পাল্টা জেরা।

মীরা : নইলে যে তুমি ধরা-ছোঁওযা দাও না, গুণের ঠাকুর !

কৃষ্ণ : কিন্তু আমার ধবা-ছোঁওয়া দেওয়া-না-দেওয়ায কি কিছু আসে যায় ? তাছাড়া, আমি তোমাকে উপদেশ দেব কোন্ অধিকারে শুনি ? আমি কি তোমার গুরু ? আমি সাতেও থাকি না, পাঁচেও না—খাই দাই বাঁশি বাজাই—নির্বিবাদী রাখালের ছেলে। বেচারি আমাকে কেন এ-ধরণের ভারিক্কি প্রশ্ন করা !

মীরা : কারণ—তোমাকে আমি ভালোবাসি।

কৃষ্ণ : ভালোবাসো—কিন্তু কী ভাবে ? কেন চাও তুমি আমার উপদেশ—যখন তোমার আমি না গুরু, না ইষ্ট ?

মীরা (রাগত) : থেকে থেকে এমন প্রশ্ন করো যে গা জ্ব'লে যায় ! তুমি আমার গুরু না হ'তে পারো, কিন্তু ইষ্ট নও একথা বলতে কি একটুও বাধল না শ্রীমুখে ? আর শুধু আমাব ইচ্ছাই বা বলি কেন—বাবা যে বাবা তিনিও তোমারি মূর্তি ধ্যান করেন, তোমারি মন্ত্র জপ করেন, কথায় কথায় বলেন তুমি "ভগবান স্বয়ং", উদ্ধৃত করেন তোমার গীতার বাণী—যে তুমি হ'লে সেই জাদুকর যিনি সর্বজীবের হৃদয়ে

চুপ ক'রে ব'সে তাদের বাঁদর নাচান—"ভ্রাময়ন্ সর্বভূতানি যন্ত্রারূঢ়ানি মায়য়া।"

কৃষ্ণ (হাসিয়া) : ভালো কথাও বলো তুমি এমন চোখা চোখা উপমা দিয়ে!—কিন্তু যাক সে কথা। আমাকে বলবে আজ একটি কথা শাস্ত্রের নজির ছেড়ে—সোজাসুজি ?

মীরা : কী ?

কৃষ্ণ : গীতার বাণী এইমাত্র উদ্ধৃত করলে কী জন্যে ? এ তো তোমার শুধু শোনা কথা। অর্থাৎ তুমি চোখে তো কোনোদিন দেখনি আমাকে একটি জীবকেও এভাবে নাচাতে ?

মীরা : কেন মিথ্যে অবান্তর কথা এনে—

কৃষ্ণ : অবান্তর ?—শোনো বলি। তুমি গীতা পড়ো বার বার। কাজেই তোমার অজানা নেই যে গীতার আর একটি বাণী এই যে, যে আমাকে যেভাবে চায় সে সেই ভাবেই পায়—"যে যথা মাং প্রপদ্যন্তে তাংস্তথৈব ভজাম্যহম্"—কেমন না? বেশ। তাহ'লে এখন বলবে আমাকে—তুমি এতদিন আমাকে কী ভাবে চেয়েছ, কী চোখে দেখে এসেছ ?

মীরা (সব্যঙ্গে) : তুমিই বলো না শুনি—যখন তোমার অজানা ব'লে কিছুই নেই এ তিন ভুবনে ?

কৃষ্ণ (মীরার চোখের দিকে স্থিরদৃষ্টিতে খানিকক্ষণ চাহিয়া) : বলব ? তবে শোনো। তুমি আমাকে কোনোদিনই করো নি বরণ গুরু ব'লে। তোমার কাছে আমি খেলার সাথী, ব্যথার ব্যথী—বড়জোর নাচ-গানের শিক্ষক—তার বেশি কিছু না। আমাকে তুমি দাও নি গুরুর অধিকার—যে-অধিকার বিনা কেউ কারুর জীবনমরণের ভার নিতে পারে না। তাছাড়া ভেবে দেখ, আমার যেটুকু তুমি দেখেছ জেনেছ বুঝেছ তা থেকে তুমি জোর ক'রে বলতে

পারো না যে আমি নিশ্চয়ই হৃদয়বান্ কি বিশ্বাসযোগ্য। এরূপ ক্ষেত্রে আমি কী ক'রে তোমার প্রশ্নের জবাব দিই বলো তো—বিশেষ যখন সমস্যাটা গুরুতর—প্রতিভাময়ী রাজকন্যার বিবাহ মহাকুলীন মহারাণার সঙ্গে ?

মীরা : কেবল কথার লকড়ি খেলা !—না আমি ছাড়ব না, তোমাকে বলতেই হবে—আমি বিবাহ করব কি করব না ? সোজা উত্তর চাই। (বাহিরে পদশব্দে) ঐ বাবা আসছেন—তোমার দুটি পায়ে পড়ি, বলো বলো—কী করব আমি ? কী জবাব দেব তাঁকে ?

কৃষ্ণ (শান্ত সুরে) : তোমার অন্তর নির্মল—তার আয়নায় দেখ চেয়ে—দেখবে জবাব জ্বল জ্বল করছে সোনার আখরে।

মীরা : না আমি কোনো আয়নার দিকেই তাকাব না—তাকাব শুধু তোমার মুখের দিকে। কী করব আমি ? ধরো যদি আমার মনের আয়নায় ফুটে ওঠে বিবাহের নির্দেশ—যা আমার কাছে বিষ ?

কৃষ্ণ (রহস্যময় ভঙ্গিতে) : অশুদ্ধের কাছে যা বিষ নির্মলার কাছে তা হ'তে পারে সুধা। খোলা হাওয়াকে কে বাঁধবে ? ঐ—এলেন তিনি। আমি চললাম। মনে রেখো—যা বললাম।

কৃষ্ণ বিগ্রহের মধ্যে অন্তর্হিত হইলেন, সঙ্গে সঙ্গে রতন সিং-এর প্রবেশ—তাহার ঠিক পিছনেই ভোজরাজ।

মীরা (পিতাকে দেখিয়া সাগ্রহে) : বাবা—! (একপদ অগ্রসর হইতেই ভোজরাজকে দেখিয়া পিছু হটিয়া নতমুখে) ও—!

রতন সিং (ভোজরাজের বাহু ধরিয়া মীরার সামনে টানিয়া) : তুমি নিশ্চয়ই জানো কে ইনি ? ছবিতে পরিচয় হয়েছে।

মীরা (আরক্ত মুখে) : জা—জানি।

ভোজরাজ (রতন সিং কথা কহিবার আগেই): মহারাজ! আমি প্রথমেই দুএকটি কথা বলতে চাই—যদি অনুমতি দেন।

রতন সিং: অনুমতি? সে কি কথা? এ তো আমার সম্মান—

ভোজরাজ (মীরার দিকে এক পা অগ্রসর হইয়া): রাজকুমারী! আমি রাজপুত্র হ'য়েও কোনোদিন রাজকীয় আদব কায়দা মেনে চলি নি। আপনার পিতৃদেবকে তাই আমি খোলাখুলি লিখে জানিয়েছিলাম আমার মনের কথা—লিখেছিলাম আমি চাই আপনার সামনে বলতে আমার বক্তব্য। উত্তরে তিনি সম্মতি দিয়ে আমাকে সাদরে নিমন্ত্রণ করেন। তাই আমি বেশি বিব্রত করব না—যা বলবার বলব সংক্ষেপেই। (মীরা ভোজরাজের দিকে চাহিতে) আপনি জানেন না আমাকে কিন্তু আমি আপনাকে বহুবার দেখেছি লুকিয়ে—শুনেছি আপনার গান আড়াল থেকে —এখানে ওখানে। আপনি আমাকে লক্ষ্য করেননি কোনোদিনই—কিন্তু আমার চোখের কানের আর কোনো লক্ষ্য ছিল না আপনার মুখ, আপনার স্বর ছাড়া। আপনার কাছে আমি এসেছিলাম পূজারী হ'য়ে, আজও আমার মনের সেই এক অবস্থা। এ আমার যৌবনের উচ্ছ্বাস নয় রাজকুমারী! আমি স্বভাবে উচ্ছ্বাসী নই। শুধু তাই নয়—মেবারের রাজপুত্র আমি—কোনোদিন কারুর কাছে মাথা নিচু করার কথা ভাবতেও পারি নি—বিশেষ ক'রে কোনো মেয়ের সাম্‌নে। কিন্তু—(হাসিতে ঈষৎ বিষাদের আমেজ)—ভগবানের নানা বিশেষণ আছে, তার মধ্যে কেবল একটি বিশেষণ আমার মন নেয়—দর্পহারী। তাই বুঝি আপনার কাছে আমাকে আসতে হ'ল উপযাচক হ'য়ে, মাথা নিচু ক'রে। আরো আশ্চর্য এই যে এ-বিনতিতে আমার মনে ছেয়ে গেল আনন্দ, গ্লানি না। (একটু পরে) এর পরে আর কিছু বলার প্রয়োজন আছে কি?

মীরা মাথা নিচু করিয়া দাঁড়াইয়া রহিল আরক্ত মুখে।

রতন সিং (অগত্যা) : মীরা! এবিষয়ে তোমাকে বলেছি আমার মতামত—তাই আজ শুধু এইটুকু ব'লেই ক্ষান্ত হব যে আমি জানি তুমি নও সাধারণ মেয়ে। কিন্তু ঠিক সেই জন্যেই আমি ডেকে এনেছি এমন একজনকে যিনি বিদ্যায়, বুদ্ধিতে, বীর্যে, চরিত্রবলে রাজস্থানে ইতিমধ্যেই অসামান্য খ্যাতি লাভ করেছেন। এ-হেন মহাজন—রাজপুতানার মুকুট-মণি মেবারের কুলতিলক—যে আমার মতন একজন অখ্যাত জায়গীরদারের গৃহে এসেছেন তোমার পাণিপ্রার্থী হ'য়ে—সে-গৌরবে আমি—আমি—

ভোজরাজ (বাধা দিয়া) : মহারাজ! গৌরব বোধ করার কথা আমার। বিশ্বাস করবেন এ আমার অত্যুক্তি নয়।

রতন সিং : রাজকুমার! আপনার বিনয় আপনারই যোগ্য—কিন্তু সারা হিন্দুস্থানে মেবারের কী পদবী না জানে কে? এহেন মেবারের ভাবী রাণা আপনি এসেছেন যেচে (গাঢ় কণ্ঠে)—আমার গৃহে, আমার মেয়েকে বরণ করতে—

মীরা (আরক্ত মুখে তীক্ষ্ণ কণ্ঠে) : বাবা—!

বলিয়া দুহাতে মুখ ঢাকিল

রতন সিং : (চমকিয়া) আমি কি অজান্তে তোমার মনে আঘাত দিয়েছি মা? (মীরাকে বক্ষে টানিয়া লইয়া) কিছু মনে কোরো না মা—আমি কি চাইতে পারি তোমাকে ছোট করতে? আমাকে এ ভাবে ভুল বুঝতে পারলে তুমি?

মীরা (মুখ তুলিয়া) : না বাবা! তবে—(ফের চোখে জল ভরিয়া আসিতে পিতার বক্ষে মুখ লুকাইয়া) আমি—আমি—(কান্না আসিয়া তাহার কণ্ঠ রুদ্ধ করিল)

রতন সিং (ক্লিষ্ট কণ্ঠে) : ছি মা! অমন ক'রে কাঁদে এমন মাহেন্দ্র

লগ্নে? তাছাড়া কেন তুমি অকারণ মন খারাপ করছ বলো তো? তুমি কি ভেবেছ আমি তোমার জোর ক'রে বিয়ে দেব—দিতে পারি? (মীরা মুখ তুলিয়া জলভরা চোখে তাঁহার দিকে তাকাইতে) কেবল সঙ্গে সঙ্গে একটা কথা ব'লে রাখি: যদি তুমি বিবাহ করতে না চাও তবে তোমার ভাইকে গদিতে বসিয়ে আমি বিবাগী হ'য়ে চ'লে যাব যেখানে দু চক্ষু যায়। কারণ···(গাঢ় কণ্ঠে)···আমার একমাত্র কন্যা সন্ন্যাসিনী হ'য়ে বিধবার ম'তন কৃচ্ছ্রসাধন করবে এ আমি চোখে দেখতে পারব না। এর বেশি আর কিছু বলতে চাই না আমি। তোমরা কথাবার্তা কও। তারপর তোমার যা অভিরুচি আমাকে বলবে—বলবে তো? (মীরা নিশ্চুপ) রাজকুমার!—মনে রাখবেন একটি কথা শুধু—মেয়ে আমার বড় অভিমানিনী।

সিঁড়িতে রতনসিং-এর পদশব্দ ধীরে ধীরে মিলাইয়া গেল। মীরা ভোজরাজের দিকে পিছন ফিরিয়া বিগ্রহের সামনে নতশিরে দাঁড়াইয়া রহিল।

ভোজরাজ (এক পা অগ্রসর হইয়া মৃদুকণ্ঠে): রাজকুমারী! আমার আর্জিটি—

মীরা (বিদ্যুদ্বেগে ফিরিয়া দাঁড়াইয়া): জানি, রাজকুমার! কিন্তু কেন এ-বিড়ম্বনা যখন আপনি ভালো ক'রেই জানেন আমার পণ—যে আমি বিবাহ করব না—করতে পারি না।

ভোজরাজ (বিব্রত): শুনেছি সেকথা—লোকমুখে। কিন্তু রাজ-কুমারী, তা ব'লে আমার বক্তব্যও কি আপনি শুনবেন না—বিশেষ ক'রে যখন আপনার দ্বারে আমি আজ এসেছি অতিথি হ'য়ে?

মীরা (লজ্জা পাইয়া, শমিত কণ্ঠে): বলুন কী—বলতে চান।

ভোজরাজ: তবু অপ্রসন্ন? (একটু পরে) তা হোক্। শুনুন,

আমি সংক্ষেপেই বলবার চেষ্টা করব। (জোর করিয়া প্রফুল্ল সুর ধরিয়া) রাজকুমারী! আমি জানি—আপনি সাধারণ মেয়েদের দলে নন—কাজেই মিথ্যা লৌকিকতার ভনিতা রেখে সোজাসুজিই বলব যা বলতে আজ আমি এসেছি। (একটু থামিয়া) শুনুন। আপনাকে প্রথম দেখার দিনেই বুঝতে পেরেছিলাম আমি একটা কথা: যে, আপনার নাগাল পাওয়া সহজ নয়—শুধু আপনার রূপ গুণ প্রতিভার জন্যেই নয়—আপনার অনমনীয় স্বভাবের জন্যেও বটে। (ঈষৎ ব্যঙ্গের আমেজ) রূপে গুণে প্রতিভায় অবশ্য আমি আপনার প্রতিস্পর্ধী নই, কিন্তু রোখালোতায় হয়ত আমি আপনার প্রতিযোগিতা করতে পারি। স্বভাব-বিদ্রোহী আমি শৈশব থেকেই—জোর ক'রে কেউ আমাকে দিয়ে কিছু করিয়ে নিতে পারে নি কোনোদিনো। এহেন মানুষ যে প্রেমের ক্ষেত্রে সহজে হার মানতে পারে না এটুকু আশা করি আপনি বুঝতে পারবেন?

মীরা (বিরস কণ্ঠে): রাজকুমার! প্রেম কথাটা শুনলেই আমার মন বিমুখ হ'য়ে ওঠে। ওকে আমি বুঝি না—চাইও না বুঝতে।

ভোজরাজ (ব্যঙ্গাভাসে): ক্ষমা করবেন রাজকুমারী, যদি বলি যে রাজকুমারীদের মতিগতি আমার অজানা নেই। তাই আমার চোখে পড়েছে বহুবারই যে তাঁরা অনেক কিছুই জানেন ও বোঝেন যা তাঁদেব জানার বা বোঝার কথা নয়।

মীরা (রুক্ষকণ্ঠে): আপনি কী ইঙ্গিত করছেন শুনি?—যে, আমি তাঁদের ম'তনই সরলতার ভঙ্গি করছি মাত্র?

ভোজরাজ (সানুরোধে): ছায়ার সঙ্গে মিথ্যে লড়াই করতে চাইছেন কেন, রাজকুমারী? আমি যে আপনাকে উত্ত্যক্ত করতে চাই না—চাইতেই পারি না—এটুকুও কি আপনি বিশ্বাস করেন না?

মীরা : বিশ্বাস করা-না-করার প্রশ্ন থাকুক। আপনি বলছিলেন সোজা-সুজি কথা কইতে চান। তথাস্তু। বলুন খোলাখুলি—কী চান আপনি আমার কাছ থেকে ?

ভোজরাজ : (একটু চুপ করিয়া থাকিয়া) যদি বলি আমাকে বিশ্বাস করতে ? বলবেন কি—এ দুরাশা ?

মীরা (মৃদু হাসিয়া) : কথার বাঁধুনি আপনার আছে—কে না মানবে ?

ভোজরাজ (প্রফুল্ল) : আপনিও উদার—কে না স্বীকার করবে ? কেবল একটা কথা : আমি মেবার থেকে মারবারে এসে ধর্না দিই নি শুধু দুটো মিষ্টিকথার মুষ্টিভিক্ষা নিয়ে ঘরে ফিরতে। চাই একটু সত্যিকার ভরসা। তাও কি মিলবে না—ফিরব খালি হাতে ?

মীরা (ঈষৎ প্রসন্ন) : রাজকুমার ! আপনার সৌকুমার্য, শালীনতা মন টানে। কিন্তু না, বেশি প্রত্যাশা করবেন না—আমাকে দিয়ে বলিয়ে নিতে চাইবেন না যাতে আমার মনের সায় নেই। হয়ত একটু ভুল ক'রে ফেলেছি কবুল ক'রে যে আপনাকে আমার ভালো লেগেছে। কিন্তু লৌকিক আদবকায়দা মেনে চলতে আমি কোনোদিনই পারি নি। তাই তারিফ ক'রে ফেলেছি আপনাকে এতখানি স্পষ্টবক্তা দেখে।

ভোজরাজ (উৎসাহিত) : যদি অভয় দেন তাহ'লে স্পষ্টবক্তাও আপনাকে অভিনন্দন করতে পারে গুণগ্রাহিণী ব'লে।

মীরা : অভয় দিতে আমি রাজি আছি—যদি আপনিও অভয় দেন যে যা হবার নয় তার স্বপ্ন দেখবেন না। শুনুন রাজকুমার, বলি আরো একটু স্পষ্ট ক'রে। দেখুন, আমি অনেক কিছুর খবর না রাখলেও কী চাই সেটুকু জানি। তাই জানি যে যাতে আমার হৃদয় সায় দেয় না তাতে আমি নেই। আশা করি আমাকে ভুল বুঝবেন না ?

ভোজরাজ (ম্লান হাসিয়া) : এখানে ভুল বুঝবার অবকাশ কোথায় বলুন ? আপনার প্রতি কথাটি নিটোল, ক্ষুরধার, ঝক ঝক করছে। কেবল—একটা দুঃখ হয়ই হয়, মনে হয় : আহা! আপনি যতটা পরিষ্কার মুখে বলতে পারেন ততটা পরিষ্কার চোখে দেখতে পেতেন!

মীরা (বুঝিতে না পারিয়া) : আমার দেখার কোথায় ভুল হয়েছে বলবেন ?

ভোজরাজ : এইমাত্র আপনি বললেন না—যা হবার নয় তার স্বপ্ন দেখা ভালো নয় ? কিন্তু কেউ কি জানে—কোন্ স্বপ্ন কেমন ক'রে সফল হয় কোন্ পথে ?

মীরা (হাসিয়া) : আমারও একটা দুঃখ হয় যে, আহা! যদি আপনিও পারতেন একটা জিনিস : হেঁয়ালি ছেড়ে সোজাসুজি কথা কইতে!

ভোজরাজ : হেঁয়ালি নয়, রাজকুমারী! আপনি যাকে স্বপ্ন-দেখা বলছেন সেটা কি সত্যিই তাই ? অপরাধ নেবেন না, কিন্তু আমরা কি সব সময়ে জানি কিসে থেকে কী হয় ? তাই কেমন ক'রে আপনি আগে থাকতে বলতে পারেন আপনার সঙ্গে আমার পরিচয়ের বীজে ফল ধরবে না ফুল আফোটাই ঝ'রে যাবে ?

মীরা (প্রসন্ন) : রাজকুমার! আপনি বাক্পটু একথা না মেনেই উপায় নেই। কিন্তু আপনার ভুল হচ্ছে কোথায় বলব ?—আপনি অনেক কিছু ধ'রে নিচ্ছেন যার ভিত্তি নেই—চাইছেন আমাকে আপনার মনের ম'ত ক'রে রচনা করতে। তাই তো আপনার ফুল-ফোটার, ফল-ধরার উপমায় আমি অস্বস্তি বোধ করছি। কারণ এ-ও তো হ'তে পারে যে আপনার কাছে যে-ফল স্বাদু আমার কাছে তা বিস্বাদ ?

ভোজরাজ : কিন্তু কোন্ ফলটা স্বাদু আর কোন্টা বিস্বাদ তা না

চোখে বলতে পারে কি কেউ? রাজকুমারী! কিছু মনে করবেন না, কিন্তু সব কিছুকে প্রথম থেকেই সন্দেহের চোখে দেখা কি ভালো?··· আপনি বুদ্ধিমতী, কিন্তু জীবন সম্বন্ধে আমি হয়ত আপনার চেয়ে কিছু বেশি দেখেছি। সেই অভিজ্ঞতার জোরেই আপনাকে বলতে চাই আজ একটি কথা: জীবনের শ্রেষ্ঠ দান অনেক সময়েই সরল ও সুলভ, তাই সুলভকে ছেড়ে দুর্লভের জন্যে হাত বাড়ানোর অনেক সময়েই হয় না শেষরক্ষা যদি সে-চেষ্টার মূলে থাকে নতুন কিছু করার দুরাগ্রহ।

মীরা (কঠিন কণ্ঠে): তাব মানে কি আপনি বলতে চাইছেন আমি বিবাহ না করার কঠিন পণ নিয়েছি শুধু নতুন-কিছু-করার সস্তা লোভে?

ভোজরাজ: কেন আমায় উল্টো বুঝছেন বাজকুমারী? "বিবাহ করব না" বলার মধ্যে যে-একটা সস্তা বাহাদুরির ভাব আছে আপনি তারি লোভে চিরকৌমার্যের ব্রত নিতে চাইছেন এ ইঙ্গিত আমি সত্যিই করতে চাই নি। আমি শুধু বলতে চাই—জীবন সম্বন্ধে একটু সহজিয়া হ'লে জীবনের অনেক কিছু থেকেই খাওয়ে বসের খোবাক পাওয়া যায়। কিন্তু অনেক সময়েই এই সহজ সত্যটিও ঝাপসা হ'য়ে ওঠে কেন বলব? কারণ আমাদের প্রায় প্রত্যেকের মধ্যেই—বিশেষ ক'রে অসামান্যদের মধ্যে—লুকিয়ে থাকে একটি বিচিত্র প্রবৃত্তি যে অসাধ্যসাধনের রক্তটিকার লোভে বিদায় দেয় সুলভ সুখের স্নিগ্ধ তিলককে। এ প্রবৃত্তিব নাম—ভাব বা বেদনাবিলাস।

মীরা (উষ্মা গোপন করিয়া শান্ত কণ্ঠে): অর্থাৎ আপনি বলতে চাইছেন—আমি স্বভাবে জীবনবিমুখ, বৈরাগী—সুতরাং ইহলোক ছেড়ে ছুটেছি পরলোকের কাছে দরবার করতে। কিন্তু আপনার এ-বিশ্লেষণ দেখতে খাসা হ'লেও ভিতরে ফাঁপা। কারণ আমি যে চলতি জীবন-

যাত্রার সুলভ সুখশান্তি ছাড়তে চাইছি তার কারণ এ নয় যে আমি কোনো অসম্ভব কিছুর কাছে চাই হাত পাততে। আমি চাই শুধু গোপালকে—আর তাও এজন্যে নয় যে তিনি আমাকে কোনো সৃষ্টিছাড়া আনন্দের দিকে টেনে নিয়ে যেতে এসেছেন, আমি গোপালকে চাই শুধু এইজন্যে যে আমাদের এ কালোর পারে শুধু তিনিই আসেন আলো হ'যে—আর কেউ না।

ভোজবাজ: আমি হয়ত এতক্ষণে একটু হদিশ পেয়েছি আপনি কী বলতে চাইছেন। কিন্তু এ-জগতের সম্বন্ধে এইই কি শেষকথা যে এখানে শুধু কালোই আছে অগম্য হ'যে? তাছাড়া কেমন ক'রে আপনি বলতে পারেন যে যাকে আপনি ভাবছেন আলো সে আলেয়া নয়? কিছু মনে করবেন না রাজকুমারী, কিন্তু জীবনের অনেক কিছুকেই আমরা ঠিক চোখে দেখতে পারি না ব'লেই না জ্ঞানের এত আদর!

মীরা: কিন্তু যদি আমি জ্ঞান না চাই? যদি চাই শুধু গোপালকে?

ভোজবাজ (একটু চুপ করিয়া): কিন্তু—কিছু মনে করবেন না—গোপাল বলছেন আপনি কাকে? মানে, যাকে আপনি ভাবছেন কায়া যদি ধরুন খতিয়ে সে হয় শুধু ছায়াবিলাস?

মীরা (উত্তপ্ত): যদি—যদি—যদি—যদি—যদি! রাজকুমার! সংশয় সন্দেহই কি জ্ঞানের চরম বাণী? তবে আমিও তো আপনার কথার প্রতিধ্বনি ক'রে বলতে পারি—আপনি যাকে ভাবছেন ছায়া যদি খতিয়ে সেই হয় কায়ার কায়া, আলোর আলো? (সুর নামাইয়া) আমি মিথ্যে তর্ক করতে বলছি না একথা। কিন্তু আপনি কি বুকে হাত দিয়ে বলতে পারেন যে আপনি জানেন কোন্‌টা সত্য আর কোন্‌টা নয়? আপনি বড়জোর বলতে পারেন—আপনার কাছে অমুক অমুক অমুক

বিশ্বাসযোগ্য। কিন্তু আমার যদি ঠিক উল্টো মনে হয়—তবে? কে বাঁধবে সেতু এ দুই দৃষ্টিভঙ্গির মধ্যে? আর তার দরকারই বা কী? আপনার জগৎ আপনার কাছে সত্য, আমার জগৎ আমার কাছে। আপনি কেন চান আমাকে আপনাব বিশ্বাসের দিকে লওয়াতে? তাছাড়া যদি ধরুন আমি ছায়াবিলাসিনীই হই তবে তাতেই বা দোষ কী? ছায়া ছায়া হ'য়ে গেলেও বিলাস তো বিলাসই থাকে। সব কিছুর শেষ কথা আনন্দ এ তো মানেন? তবে ছায়াবিলাসে দোষ কি—যখন ছায়ার না হ'লেও বিলাসের ভিৎ আনন্দ?

ভোজরাজ: রাজকুমারী! আপনি আমাকে ফেলেছেন সত্যিই উভয়-সঙ্কটে। কারণ না পারি আপনাকে মিথ্যাবাদিনী ভাবতে, না পারি সত্যদর্শিনী ব'লে গ্রহণ করতে। তাছাড়া তর্কটা কি আসলে বিলাস নিয়ে না বিলাসের স্থায়িত্ব নিয়ে? সোনাব হরিণ দেখতে স্বর্ণবর্ণ ব'লে কি সে সত্যিই তাই? সোনার আভাটাই তো সব নয়—হরিণটারও তো চাই হরিণ হওয়া।

মীরা: রাজকুমার! উপমা অনেক সময়ে ধারে কাটতে পারে বটে কিন্তু ভার ব'লেও কি একটা জিনিস নেই? আপনি যুক্তির ধনুর্ধর হ'য়েও কি জানেন না এই শাদা কথাটা যে উপমার বাণের পিছনে পালক থাকলেও সামনে নেই তীর—ধনুক থেকে তাকে ছাড়া যায় কিন্তু লক্ষ্যবেধ করতে সে পারে না?

ভোজরাজ (হাসিয়া): রাজকুমারী! যুদ্ধ করতে যে আসে নি তাকেও আপনি তাল ঠুকে কেন নামাতে চাচ্ছেন রণাঙ্গনে? কেন এই শাদা কথাটা বুঝতে চাইছেন না যে যে-গোপালকে আপনি ছাড়া কেউ কোনোদিন দেখে নি চর্মচক্ষে—সে-অদ্ভুত অ-পদার্থকে পদার্থ ব'লে মেনে নিতে বাধে? (সহসা মাথা নাড়িয়া)

আমাকে ক্ষমা করবেন রাজকুমারী—আমি একটু বেফাঁশ ব'লে ফেলেছি—

মীরা (ব্যঙ্গাভাসে) : কিচ্ছু বেফাঁশ হয় নি—নিশ্চিন্ত থাকুন। কারণ আমার গোপাল সত্যস্বরূপ, সত্যকথায় রাগ করেন না। তার মানে আপনি তাঁকে "অদ্ভুত" উপাধি দিয়ে ভুল করেন নি—আমার গোপাল অদ্ভুত তো বটেই যেহেতু তিনি আসেন এমন রাজ্য থেকে যাকে আপনি ধারণাও করতে পারেন না।

ভোজরাজ (ব্যঙ্গের উত্তরে শ্লেষ ধরিয়া) : তিনি যেখান থেকে ইচ্ছে আসুন—যেখানে ইচ্ছে যান না—খুশখেয়ালে। আমার আপত্তি তাঁর আসা-যাওয়ায় নয়। আমার জিজ্ঞাস্য—আপনি কী দুঃখে তাঁর পায়ে দাসখৎ লিখে দিতে চাইছেন? কোন্ অধিকারেই বা তিনি আপনাকে চান তাঁর তাঁবে রাখতে? তাঁর প্রতি আপনার ভালোবাসা নিশ্চয়ই দৈহিক পর্যায়ে পড়ে না?

মীরা (সবিস্ময়ে) : দৈহিক ভালোবাসা মানে?

ভোজরাজ (মীরার চোখে চাহিয়া) : এ-প্রশ্নের মানে?

মীরা (আরও বিস্মিত) : আপনার কথা আমি বুঝতে পারছি না। ভালোবাসা বলতে আমি বুঝি— মানে গোপালকে আমি ভালোবাসি। দৈহিক ভালোবাসা আবার কী জিনিস?

ভোজরাজ (চমকিয়া) : রাজকুমারী! আমি এতক্ষণ বৃথাই কথা-কাটাকাটি করেছি একটা মস্ত ভুলবোঝার দরুণ। এখন থেকে আর তর্কাতর্কি করব না।

মীরা (বুঝিতে না পারিয়া) : ভুলবোঝা?

ভোজরাজ (বিজ্ঞ হাসিয়া) : তা ছাড়া আর কী বলব বলুন, যখন আপনার অনুরাগিণী মনটি "দৈহিক" শুনেই প'ড়ে গেল অথই জলে?

মীবা (বিরক্ত) : হেঁয়ালিতে কথা কওয়া আপনাব কাছে বাহাদুরি মনে হ'তে পারে—কিন্তু আমার কাছে অরুচিকব।

ভোজরাজ (একটু হাসিয়াই গম্ভীর হইয়া) : বাগ করবেন না রাজকুমারী! কিন্তু আমি কী বলব সত্যিই ভেবে পাচ্ছি না। যে-চুম্বকশক্তি নরনাবীকে টানে পরস্পরের দিকে তার সম্বন্ধে আপনি যে কোনো থবরই রাখেন না—আপনি কেমন ক'বে বুঝবেন আমার কথা?

মীরা (বিরক্ত) : খবব রাখি না মানে? আমি শিশু নই যে—

ভোজরাজ (হাসিয়া) : রাজকুমারা! আপনার রাগও দেখতে এত সুন্দর কেন জানেন? কারণ এ-রাগ মানায় এক শিশুকেই। এ জটিল জগতে সরলতা দেখলে মন ভ'রে না ওঠে কার?

মীরা (অসহিষ্ণু) : থামুন আপনি। শিশু আমি নই। গোপালের সঙ্গে যে আটবছর মিশেছে সে থাকতে পারে শিশু?

ভোজরাজ (হাসিয়া) : তবে শিশু বললে রাগ করেন কেন? যে দৌড়োতে শিখেছে তাকে যদি কেউ বলে তুমি হামাগুড়ি দিয়ে চলো তবে সে কি রাগ করে, না হেসে উড়িয়ে দেয়? তাছাডা শুনুন, আপনি যখন একান্তভাবেই চান সত্যকে তখন সত্য কথায় রাগ করতে পারেন না।

মীবা : এখানে সত্য বলছেন কাকে?

ভোজরাজ : আমাদের এই অভিজ্ঞতাকে, যে জানে—শিশুব ভালোবাসা ও যুবক যুবতীর ভালোবাসা এক বস্তু নয। প্রেম সম্বন্ধে আপনাব ধারণা এখনও নাবালিকা। তাই তো আমি উৎফুল্ল হযেছি এই ভেবে যে একদিন আপনার মনের বাগানে ফুটবেই যৌবনের ফুল, আর সেদিন আপনাকে কারুর ব'লে দিতে হবে না ফুল কেন চায় ভ্রমরকে।

মীরা : ফের সেই উপমা?

ভোজরাজ : আচ্ছা আচ্ছা রাজকুমারী, আমি আর উপমা দেব না, বিশেষ যখন আপনি আমাকে কতখানি আশ্বাস দিয়েছেন ও কেন তা জানেন না। শুধু বিদায় নেবার আগে আর একটিবার শুনতে চাই আপনার মুখে যে আমাকে আপনার একটুখানিও ভালো লেগেছে।

মীরা (ভ্রূকুটি করিয়া) : কেউ এমন ঢঙে উচ্চাঙ্গের হাসি হাসলে তাকে ভালো লাগতে পারে কোনো মেয়ের ?

ভোজরাজ (মুহূর্তে গম্ভীর হইয়া) : এমন কঠিন কথা কেন বলছেন রাজকুমারী ? যার সঙ্গে আমার আজ শুভদৃষ্টি হ'ল তার প্রাপ্য শ্রদ্ধা, সমাদর—উপহাস অনাদর তো নয়। একথার মানে কী, আপনি বুঝবেন—যেদিন আপনার কুমারী মনের আকাশে জেগে উঠবে আলোর পূর্বরাগ। আমি থাকব সেই দিনেরি পথ চেয়ে।

মীরা : আপনার কথার মাথামুণ্ডু না থাকলেও কেন জানি না শুনতে মন্দ লাগে না। মানতেই হবে আপনি কথাকুশলী।

ভোজরাজ (নাটকীয় ভঙ্গিতে কুর্নিশ করিয়া) : আর আমাকেও মানতেই হবে যে আপনি অপরূপা সত্যনিষ্ঠায় ও সরলতায়।

মীরা (সগর্বে) : একথা সত্য যে আমি সত্যকে যেমন ভালোবাসি তেমন আর কিছুকে নয়। কিন্তু আপনি বারবার আমাকে সরল বলছেন—এতে আমার মন কেমন যেন স্বস্তি পাচ্ছে না।

ভোজরাজ : আমার মনকে যদি পরিষ্কার ক'রে দেখাতে পারতাম তবে আপনার অস্বস্তি হ'য়ে উঠত আনন্দ।

মীরা : ফের মোড় নিচ্ছেন বাঁকা পথে ?

ভোজরাজ : রাজকুমারী ! তীর্থের পথ কি কখনো সোজা হয় ?

মীরা : সুখী হ'লাম এটুকু আপনি জানেন ব'লে। কেবল ঐ সঙ্গে আরো একটু জেনে রাখুন : যে, আমার তীর্থের পথও অমনিই বাঁকা—যার লক্ষ্য গোপাল।

ভোজরাজ : একথা মনে রাখব যদি আপনিও করুণা ক'রে মনে রাখেন যে আজকের আমির কাছে যে-তীর্থ পরম লক্ষ্য কালকের আমির কাছে সে হ'য়ে উঠতে পাবে পান্থশালা।

মীরা : না, পারে না। কারণ আমার কাছে গোপাল শুধু তীর্থ নয়—ভবিতব্য।

ভোজরাজ : ভবিতব্য ?

মীরা (হাততালি দিয়া) : বেশ হয়েছে—এবার আপনি পড়েছেন ফাঁপরে।

ভোজরাজ : আপনার আনন্দে আমারও আনন্দ। কেবল দয়া ক'রে বলবেন কি—কেন গোপাল গোপাল করছেন ?

মীরা : শুনবেন কেন ? শুনুন তবে। যে-সন্ন্যাসীঠাকুর আমাকে দিয়েছিলেন (বিগ্রহ দেখাইয়া) গোপালকে তিনি আমাকে বলেছিলেন আমি যেন কখনো বিবাহ না করি।

ভোজরাজ (সব্যঙ্গে) : রাজকুমারী ! ক্ষমা করবেন : আমি দৈবজ্ঞকে দেবতা মনে করতে অক্ষম—যদি তাঁর বিধানের পিছনে যুক্তি না থাকে।

মীরা : যুক্তি আছে। তিনি বলেছিলেন বিবাহ করলে আমি অসুখী হব, কারণ যে একবার গোপালকে ভালোবাসে সে আর কাউকে ভালোবাসতে পারে না। (মৃদু হাসিয়া) আজো মনে পড়ে মা-র সে কী রাগ একথা শুনে! সন্ন্যাসীঠাকুরকে তিনি ধুলোপায়েই বিদায় দিলেন।

ভোজরাজ : তাঁর সহজবোধকে সাধুবাদ দেই : নির্বোধ ভিক্ষুককে যে শ্রদ্ধা করতে নেই তাঁর মাতৃপ্রাণ সহজেই বুঝেছিল।

মীরা (অসহিষ্ণু) : শ্রদ্ধেয় মানুষকে ভিক্ষুক ব'লে অশ্রদ্ধা করেন আপনি কোন্ অধিকারে জানতে পারি কি ?

ভোজরাজ (উষ্মার স্বরে) : মানুষ মাত্রেরই আছে তাব স্বাধীন মতামত প্রকাশ করবার অধিকার।

মীরা (রুষ্ট) : বেশ। তবে সেই অধিকারে আমিও প্রকাশ কবব আমার স্বাধীন মত—যে, কিছু না জেনে যে-মানুষ কোনো বিষযে মতামত প্রকাশ করে তার উপাধি—হঠকারী।

ভোজরাজ (তপ্ত স্বরে) : কিন্তু আপনিই বা কেমন ক'রে জানলেন সন্ন্যাসীদের চালচলন সম্বন্ধে আমি কিছু জানি কি না ? (সুর চড়াইয়া) শুনুন রাজকুমারী! ছেলেবেলা থেকেই আমি দেখে আসছি ওদের—তাই খুব ভালো ক'রেই জানি ওদের বুদ্ধির, সামর্থ্যের দৌড়। জীবনযুদ্ধে যারা হার মানে তারাই পালিয়ে গিয়ে হয় সন্ন্যাসী—ভগবানের নাম ধাব ক'রে বসে মোহান্তের গদিতে—যত সব অকর্মণ্য ভণ্ডের দল!

মীরা (জ্বলিয়া) : আমার গুরুদেবকে বলেন আপনি ভণ্ড ?—যে-গুরু আমাকে দিয়ে গেছেন গোপালকে ?—যাঁর পাদুকা বহন করবারও আপনি যোগ্য নন ? যান আপনি—এই মুহূর্তে। আপনার মুখদর্শন করাও পাপ।

ভোজরাজ (ত্রস্ত স্বরে) : রাজকুমারী! আমি ক্ষমা চাইছি। আমি জানতাম না—তিনি আপনার গুরু!

মীরা (তারস্বরে) : আর একটিও কথা নয়। আপনি যান—যান—যান বেরিয়ে!

চিৎকার শুনিয়া রতন সিং ছুটিয়া আসিলেন। ভোজরাজ মাথা নিচু করিয়া দাঁড়াইয়া রহিলেন। মীরা ঘরের এককোণে সরিয়া গিয়া বিগ্রহের সামনে দুই হাতে মুখ ঢাকিয়া দাঁড়াইয়া রহিলেন।

রতন সিং (শঙ্কিত): কী, কী—কী হয়েছে? মীরা! রাজকুমার!

ভোজরাজ (বিষণ্ণ): সব অপরাধ আমারি, মহারাজ! অন্ধ আমি! (একটু পরে) আর সবচেয়ে দুঃখ এই যে, ঝাপটা এলো ঠিক্ রাখীবন্ধনের পরম লগ্নে। শুনুন—

ভোজরাজ রতন সিংকে ঘরের অন্য দিকে টানিয়া মৃদুস্বরে বলিলেন কয়েকটি কথা।

রতন সিং: হুঁ। (দীর্ঘনিশ্বাস ফেলিয়া) যা হবার হ'য়ে গেছে··· কিন্তু···কিন্তু আপনি হাল ছেড়ে দেবেন না রাজকুমার—আমাদের সবাইকার অনুরোধ। (মৃদুস্বরে) খতিয়ে অপরাধ আপনার নয় রাজকুমার, অপরাধ আমারি।·· ওকে যদি আমি একটুও চোখে চোখে রাখতাম! (বিষণ্ণ সুরে) কিন্তু কী করব বলুন? আটবছর বয়সেই মাতৃহারা মেয়ে—কী যে অভিমানিনী—একটি কড়া কথাও সইতে পারত না। তাই আমি কাউকে দিই নি ওকে শাসন করতে—ও চ'লে এসেছে বরাবর নিজের খেয়ালে। তবে ও থাকত ওর নাচ গান পূজা অর্চনা নিয়ে —বলবার কীই বা ছিল? কইত গোপালেরি কথা, গাইত গোপালেরি গান, নাচত গোপালেরি নাচ। ভাবতাম—ভালোই তো, ভগবানকে নিয়েই তো আনন্দ। কেউ কেউ বলত মাথা নেড়ে—এত বাড়াবাড়ি কিছু নয়—কেউ বা বলত এ মাথা খারাপের পূর্বলক্ষণ!

ভোজরাজ: কেন?

রতন সিং: ও যে যার তার কাছে ব'লে বেড়াত, সরলভাবেই,

য ও গোপালের সঙ্গে কথা কয়, তাঁর সুরে সুর মিলিয়ে গান করে, তাঁর সঙ্গে হাত ধরাধরি ক'রে নাচে—আরও কত কী।

ভোজরাজ: কিছু মনে করবেন না মহারাজ, এ ধরণের কথা শুনলে মানুষ একটু চম্‌কে ওঠেই। কিন্তু সে যাক। আমি জানতে চাই: আপনার কী মনে হ'ত এ সব শুনে?

রতন সিং (চিন্তিত সুরে): বলা মুস্কিল, কুমার! এক একবার মনে হ'ত—কল্পনার জল্পনা। কিন্তু ও গাইত এমন সব গান যেসব গানের অনেক কথার মানেই ও জানত না, বলত—গোপাল ওকে শিখিয়েছে। নাচত এমন সব নাচ—এমন কঠিন তালে—যেধরণের নাচ বা তাল আয়ত্ত করা ভাল নর্তকীর পক্ষেও দুঃসাধ্য। কিন্তু এর চেয়েও অদ্ভুত কাণ্ড ঘটত দিনের পর দিন।

ভোজরাজ (সৌৎসুক্যে): যথা?

রতন সিং: সে কি একটা? মাত্র একটা দৃষ্টান্ত দেই: ও প্রতি পূর্ণিমায় ভোগ দিত গোপালকে—অর্থাৎ নিজে হাতে মোহনভোগ ক'রে বিগ্রহের সামনে ধরত। তারপর গোপাল খেতেন।

ভোজরাজ: বলেন কি!

রতন সিং (ম্লান হাসিয়া): আর বলি কী! সে সময়ে যদি আপনি থাকতেন তবে স্বচক্ষেই দেখতেন। আমরা সবাই দেখেছি—আর একবার নয়, বার বার। হ'ত কি, ও পাথরের থালায় ভোগ সাজিয়ে বিগ্রহের সামনে রেখে ঘর থেকে বেরিয়ে যেত—আমরাও যেতাম। ঘরে কেউ থাকত না। খানিক বাদে ও অন্য ঘরে ব'সে প্রার্থনা করতে করতে বলত—গোপাল খাচ্ছেন পরমানন্দে। তৎক্ষণাৎ আমরা সবাই তালা খুলে ঘরে ঢুকে গিয়ে—অবাক্: মোহনভোগের অনেকখানিই অদৃশ্য। শুধু তাই নয়—যেটুকু উদ্বৃত্ত থাকত তার কিনারায়

স্পষ্ট ছোট ছেলের দু'তিনটে আঙুলের দাগ। এ সবাই দেখেছে—বাড়িশুদ্ধু।

ভোজরাজ : কী বলছেন মহারাজ! ঘরের মধ্যে কেউ লুকিয়ে—

রতন সিং (মাথা নাড়িয়া) : না না—আমরা দেখেছি ঘর থালি—আমরা মানে আমি, ওর মা, মাসিরা, ভাই বোন—সবাই। তাছাড়া শুধু ভোগ-দেওয়াই নয়—কখনো বা ওর সমাধি ম'তন হ'ত। হঠাৎ দেখেছি চোখে ধারা—খালি হাত খুলে ধরল ভিক্ষা চাওয়ার ভঙ্গিতে—অম্‌নি সে হাতে কোত্থেকে এল মোহনভোগ প্রসাদ—কখনো বা শাদা রঙের, কখনো পাটল!

ভোজরাজ : চোখের ভুল নয় তো?

রতন সিং : সবাই মিলে খেয়েছি যে—বলবেন কি জিভেরও ভুল? তাছাড়া সে প্রসাদের রেখে দেওয়া হ'ত খানিকটা—কই উবে তো যেত না। কখনো বা দেখতাম তার মধ্যে কুঙ্কুম বা তুলসী পাতা। হয়ত ভাবছেন বানানো?

ভোজরাজ : না না। তবে—কিন্তু···যাক। তারপর?

রতন সিং : তারপর আর কী: এ চাইত ওর মুখের পানে, পণ্ডিতেরা এসে মাথা নাড়তেন, বড় বড় শাস্ত্রবাক্য বিজ্ঞভাবে আবৃত্তি ক'রে ঢাকতে চাইতেন নিজেদের পরম অজ্ঞতা। আপনার মুখচোখের ভাব দেখে কুণ্ঠা হচ্ছে রাজকুমার!—জানি না, হয়ত ভাবছেন বাড়িশুদ্ধু সবাইয়ের মাথা খারাপ—কিন্তু মুস্কিল এই, বাইরের লোকও সাক্ষী আছে—বলেন তো তাদের তলব করতে পারি।

ভোজরাজ : ছি ছি মহারাজ! আপনার চরিত্র ও সত্যনিষ্ঠার কথা না জানে কে? আমাকে অকারণ অপরাধী করবেন না। তবে কী জানেন? অলৌকিক ঘটনা আমি কখনো চাক্ষুষ করিনি আজ

পর্যন্ত—তাই এ-ধরণের কথা শুনলে মন সহজে নিতে চায় না। কিন্তু সে যাক। আমি শুধু একটা কথা জানতে চাই: এসব ব্যাপারকে আপনারা কী চোখে দেখতেন?

রতন সিং: কুমার! আমি একটা জিনিস এই সূত্রে লক্ষ্য করেছি: যে গড়পড়তা মানুষ কোনো রকম অসামান্যতাই সইতে পারে না। তাই ওর সম্বন্ধে নানা রটনা রটত। কেউ বলত—ওর মাথায় ভূতে ভর করেছে, কেউ বলত কল্পনা—আরও কত কী—ফলে বাড়ত শুধু দুশ্চিন্তার বোঝা আর একটা নাম-না-জানা ভয়: কী হবে এ-মেয়ের গতি? কোথায় এর শেষ? সবাই বলত ওর বিয়ে দিলেই সব সেরে যাবে। কিন্তু মেয়ে নিল পণ—বিয়ে করবে না। তারপর সবাই মিলে ওকে বোঝানোর পালা। কিন্তু ওর না-কে হাঁ করে কার সাধ্য?

ভোজরাজ: এটুকু আমি অন্তত বুঝেছি হাড়ে হাড়ে।

রতন সিং (ভোজরাজের হাত চাপিয়া ধরিয়া): কিন্তু শুধু বুঝলেই হবে না কুমার! আপনাকেই করতে হবে এ-অসাধ্য-সাধন—ফেরাতে হবে ওর মন।

ভোজরাজ (ম্লান হাসিয়া): আপনার কথা শুনে দুঃখের মাঝেও হাসি এল মহারাজ, কালিদাসের একটি শ্লোক মনে পড়ে: "সমীরণো নোদয়িতা ভবেতি ব্যাদিশ্যতে কেন হুতাশনস্য!" অর্থাৎ, বাতাসকে কি বলতে হয় আগুনকে উস্কে দাও? কিন্তু হয়েছে কি জানেন? নিভন্ত আগুনকে উস্কে দেওয়া বাতাসের পক্ষে যত সহজ—রোখালো মনের মতির মোড় ফেরানো তার চেয়ে অনে—ক বেশি কঠিন। এখানে জোর জুলুম করলে হবে ইতো ভ্রষ্ট স্ততো নষ্টঃ।

রতন সিং: জানি। কিন্তু তা ব'লে হাত গুটিয়ে ব'সে থাকা তো সম্ভব নয়।

ভোজরাজ (চিন্তাবিষ্ট সুরে) : যদি কোনো রকমে ওঁকে বিশ্বাস করানো যেত যে গোপাল চান ও বিবাহ করে···কিন্তু তা-ই বা কী ক'রে হয়? (হঠাৎ ঘরের অপর কোণে বিগ্রহের সামনে উপবিষ্টা মীরার দিকে চোখ পড়িতে) এ-আলোচনা এখন মুলতুবি থাক্— আপনি ওঁকে গিয়ে একটু শান্ত করুন। বলুন ওঁকে (উচ্চস্বরে) আমি অত্যন্ত দুঃখিত। (আরো উচ্চস্বরে) সত্যি, আমার খুব অন্যায় হয়েছে—আমি অনুতপ্ত, ক্ষমাপ্রার্থী। আমি যদি ঘুণাক্ষরেও জানতাম যে সে-সন্ন্যাসী ওঁর গুরুদেব তাহ'লে কখনই এমন বেচাল হ'ত না। (স্বর নামাইয়া) আমি বেরিয়ে যাচ্ছি—আপনি ওঁকে শান্ত করুন। আমি দোরের ঠিক্ বাইরেই থাকব—ঠিক সময়ে হাজিরি দেব।

ভোজরাজ পর্দা সরাইয়া নিক্রান্ত হইতে রতন সিং খানিকক্ষণ চুপ করিয়া ভাবিলেন। তারপর মীরার দিকে অগ্রসর হইয়া তার ঠিক পিছনে দাঁড়াইয়া আবার খানিকক্ষণ চুপ করিয়া ভাবিতে লাগিলেন। এমন সময়ে শুনিলেন মীরা প্রার্থনা করিতেছে। তিনি উৎকর্ণ হইয়া শুনিতে লাগিলেন ঃ

মীরা (কাতর স্বরে) : গোপাল গোপাল! কোথায় তুমি? ডেকে ডেকে আমি সারা হ'য়ে গেলাম, কিন্তু কই তুমি? কেন তুমি আসছ না—বলছ না কথা? তুমি দিশা না দিলে কে দেবে বলো? তুমি বলতে—আমাকে তুমি ভালোবাসো। কিন্তু এ কেমন ভালোবাসা তোমার, গোপাল? সুখের সময়ে কত সোহাগ—দুঃখের দিনে অন্তর্ধান! শুনি তুমি অন্তর্যামী—প্রতি তৃণটির আশা নিরাশার সাথী প্রতি ফুলটির ব্যথার ব্যথী। আমাদের অন্তরের প্রতি স্পন্দনটি তোমার কাছে পৌছয়···শুধু আমারই বেলায় তুমি রইলে দূরে। আমি আজ যে বড় আর্ত হ'য়ে তোমাকে ডাকছি গোপাল! বলো আমি কী

করব? বিবাহ করব? করতেই হবে? কিন্তু আমি তো আর কাউকে ভালোবাসতে পারব না গোপাল! তবে? (একটু অপেক্ষা করিয়া) কথা কইবে না তবু? দেবে না পথের নির্দেশ? আমি বুঝি না নাথ, তোমার লীলা। আমি শুধু জানি তুমি প্রভু—আমি দাসী, তুমি দেবতা—আমি শরণাগতা। বলো আমি কী করব? বাবা বলেন আমি বিবাহ না করলে তিনি আত্মহত্যা করবেন, বিবাগী হবেন—আরো কত কী। তিনি বলেন শুধু আমার জন্যেই তিনি সংসারে আছেন, নৈলে কবে চ'লে যেতেন বৃন্দাবনে। তাঁর মনে ব্যথা দেবই বা কী ক'রে? অথচ তোমার সেবিকা হ'য়ে আর কার চরণ চাইব বলো তো? তোমার পায়ে পড়ি—এসো কাছে—বলো বলো বলো আমার কী কর্তব্য? (একটু চুপ করিয়া) তবু নীরব থাকবে—বলবে না কথা?

চোখের জল মুছিয়া মীরা গাঢ় কণ্ঠে গাহিল :

যে তোমারে চায় যে-রূপে ধরায়—শুনি করো দয়া তারে,
অন্তরযামী জীবনের স্বামী—রাজি' জীবনের পারে।

ছাড়িয়া স্বজন গহন কানন মাঝে শিশু ধ্রুব নাথ,
ডাকিল তোমারে—দিলে দেখা তারে, পুরালে তাহার সাধ।

করি-পদতলে, আহবে, অনলে রেখেছিলে প্রহ্লাদে,
নৃসিংহ-রূপ ধরি' অপরূপ নাশি' অরি নখাঘাতে।

বাঁধিতে সাগরে সেতু সীতা তরে দয়াল দুঃখহারী!
পাতালে নামিয়া দানবেরে দিয়া কোল হ'লে তার দ্বারী।

যেথা যে তোমায় ডেকেছে—কৃপায় দিয়েছ দেখা অপারে,
শুধু মীরা দীনা আলোক-বিহীনা রবে কি অন্ধকারে?

মীরার গণ্ড বাহিয়া অশ্রু ঝরিল, সে বার বার গাহিতে লাগিল :

দাও দেখা হরি, এসো হ'য়ে তরী অকূল পাথারে আজ,
তমসা-তুফানে তারকা-বিধানে দাও দিশা, হৃদিরাজ !

রতন সিং চোখ মুছিলেন। তাঁহার চিন্তাগাঢ় ললাটে বলীরেখা ফুটিয়া উঠিল। সহসা কি-ভাবিয়া তাঁর মুখ উদ্ভাসিত হইয়া উঠিল, তিনি চকিতে মীরার মাথায় হাত রাখিলেন।

রতন সিং (বালকের কণ্ঠস্বর অনুকরণ করিয়া) : মীরা ! আমি এসেছি—বিগ্রহের মধ্যে থেকে কথা কইছি। চোখ খুলো না—নিজের অন্তরের পানে তাকাও। বলো—তুমি শরণাগত শুধু মুখে না অন্তরে ?

মীরা (মুদিত চক্ষে) : তুমি কি জানো না গোপাল ?

রতন সিং : বেশ। তবে কথা দাও আমি যে-আদেশই কেন না দিই তুমি পালন করবে ?

মীরা (আকুল কণ্ঠে) : করব গোপাল, করব। তুমি যে-বিধানই দাও না কেন নেব আমি মাথা পেতে।

রতন সিং : তবে শোনো। নারীর মন্দির—গৃহ, নারীর দেবতা—স্বামী। তোমাকে বিবাহ করতে হবে—সেই তোমার পরম সাধনা।

মীরা (একটু চুপ করিয়া থাকিয়া) : বেশ। করব আমি বিবাহ—তার ফল যা-ই হোক।

রতন সিং (সোল্লাসে) : আমি প্রসন্ন হ'য়ে করছি তোমাকে আশীর্বাদ—তুমি—

রুদ্ধ ক্রন্দনের ঢেউয়ে মীরার দেহ থর-থর করিয়া কাঁপিয়া উঠিল…
পরমুহূর্তে মূর্ছিত হইয়া সে মাটিতে গড়াইয়া পড়িল।

রতন সিং (আকুল কণ্ঠে) : মীরা মীরা !—মা আমার !—

ভোজরাজের প্রবেশ

রতন সিং : কুমার! মীরা মূর্ছা গেছে। তুমি ঐ পাখাটা দাও তো—আমি ওকে পালঙ্কে শোয়াই।

রতন সিং মীরাকে তুলিয়া পালঙ্কে শোয়াইয়া তাহার মাথা নিজের কোলে রাখিয়া ভোজরাজের দিকে চাহিলেন

রতন সিং : না—পাখাটা আমাকে দাও—(পাখা করিতে করিতে জোর করিয়া শান্ত কণ্ঠে) মার আমার এরকম মূর্ছা প্রায়ই হয়—ভয়ের কিছু নেই। ঐ পাত্রটি থেকে একটু জল—

ভোজরাজ (পাত্র হস্তে মীরার কপালে জলসেক করিতে করিতে): মহারাজ!

রতন সিং তাহার দিকে চাহিলেন

ভোজরাজ (পাত্রটি মীরার শিয়রে রাখিয়া): মহারাজ! এ-পরম পুরস্কারের কী প্রতিদান দেব জানি না আমি—শুধু…শুধু…এইটুকু বলতে পারি (গাঢ়কণ্ঠে) যে আমি এ-অমূল্য দানের করব না কোনোদিন অমর্যাদা। (কটির অসিকোষ হইতে অসি নিষ্কাশিত করিয়া নতজানু হইয়া ললাটে স্পর্শ করিয়া) আমি শপথ করছি যে আপনার কন্যাকে আমি বরণ করব যেমন ভক্ত করে প্রতিমাকে।

রতন সিং (ভোজরাজের আনত শিরে হাত রাখিয়া): আর আমি তোমাকে করছি আশীর্বাদ বৎস—যেন…যেন তোমরা সুখী হও। আর —(তাঁহার গণ্ড বাহিয়া অশ্রু ঝরিয়া পড়িল)—আর প্রার্থনা করি…যেন… যেন আমাকে ঠাকুর ক্ষমা করেন—যদি ভুল ভেবে আমি…আমি…

অশ্রু-উচ্ছ্বাসে তাঁহার কণ্ঠ রুদ্ধ হইল—তিনি দুহাতে মুখ ঢাকিয়া শিশুর ম'ত কাঁদিতে লাগিলেন।

যবনিকা

দ্বিতীয় অঙ্ক

প্রথম দৃশ্য

মীরার বিবাহের এগার বৎসর পরে। ভোজরাজ এখন মেবারের—মহারাণা, মীরা—মহারাণী। রাজধানী—হ্রদমেখলা উদয়পুর-নগরী। স্থান—রাজপ্রাসাদের সুরম্য উদ্যান। কাল—প্রভাত, উদয়লগ্ন। যবনিকা উঠিলে দেখা যাইবে—উদ্যানে একটি মর্মরবেদী-পীঠে ভোজরাজ আসীন। থাকিয়া থাকিয়া তিনি চাহিতেছেন মন্দিরের পানে, কখনো বা একদৃষ্টে উদ্যানের পাদমূলে বিস্তৃত হ্রদের পানে। সামনে ফোয়ারা হইতে উৎক্ষিপ্ত জল নবারুণরাগে ঝিকমিক করিতেছে। সহসা ভোজরাজের চমক ভাঙিল: উদ্যানের অপরপ্রান্তে অবস্থিত মন্দিরে মীরা তাঁহার প্রভাতী ভজন গাহিতেছেন। ভোজরাজ মন্দিরসোপানের দুতিনটি ধাপ উঠিয়া স্থিরনেত্রে চাহিয়া রহিলেন মন্দিরের পানে। দেখা যায়—মন্দিরের মধ্যে মালা হাতে মীরার নৃত্য, শোনা যায় তাঁহার স্বরচিত বিখ্যাত গান:

আমায় রেখো হে তব অধীন:
তোমার চরণধূলায় লীন।

অধীন রহিব, বীথিকা রচিব করিব ফুলচয়ন:
উঠিয়া উষায় দিব রাঙা পায় মালা—লভি' দরশন।

বঁধু, নিতি তব শ্রীচরণে রব' জনমে মরণে দাসী:
নামের পারানিবরে তব জানি—কাটিবে যুগের ফাঁসি।

ছায়াসম রব' কিঙ্করী তব, যাব না কোথাও আর:
রাখিবে যেমনি রহিব তেমনি—যা দিবে করি' স্বীকার।

দিয়ে আঁখিজল সরণি অমল করিয়া বিছাব হিয়া:
পথে পথে হরি, নাম তব মরি, গাহি' প্রেমে উছসিয়া।

জ্ঞানী জ্ঞান তরে যোগী ধ্যান তরে তব তীরে রহে জাগি' :
সাধু জপ সাধে, মীরা শুধু কাঁদে প্রেমের ভজন লাগি'।

পীত অম্বর, শিরে সুন্দর শিখিচূড়া, গলে মালা :
শ্রীবৃন্দাবনে এসো হে মিলনে মোহন-মুরলীওয়ালা।

আছ অন্তরে যদি—আঁখি ঝরে মীরার কেন অধারে ?
নিশীথ গহন : দাও দরশন—প্রেম-যমুনার তীরে॥

গান শেষ হইলে ভোজরাজ দীর্ঘনিশ্বাস ফেলিয়া মন্থর-বিভঙ্গে ফিরিয়া আসিলেন ফোয়ারার কাছে—অন্যমনস্কভাবে চাহিয়া রহিলেন উৎক্ষিপ্ত জলের পানে। কিন্তু মন তাঁহার লগ্ন মন্দিরে, থাকিয়া থাকিয়া মীরার কিন্নরীকণ্ঠস্বর ভাসিয়া আসে, আর তিনি সতৃষ্ণ নয়নে তাকান মন্দিরের দিকে। সহসা শোনা যায় মীরার কীর্তন :

মধুরং মধুরং বপুরস্য বিভো
মধুরং মধুরং বদনং মধুরম্।
মধুগন্ধ-মৃদুস্মিতমেতদহো
মধুরং মধুরং মধুরং মধুরম্॥

অধরং মধুরং বদনং মধুরং
হৃদয়ং মধুরং গমনং মধুরম্।
বচনং মধুরং চরিতং মধুরং
চলিতং মধুরং ভ্রমিতং মধুরম্॥

স্তব শেষ হইলে মন্দিরের মধ্যে শাঁক বাজিয়া উঠিল। সহসা পিছনে পদশব্দে ভোজরাজ চমকিয়া ফিরিতেই দেখেন তাঁহার দিদি উদয়বাই দাঁড়াইয়া

ভোজরাজ (ভ্রূভঙ্গে) : কী ? এবার কোন্ মৎলবে শুভাগমন ?

উদয়বাই (সানুনয়ে) : ভাই ! তুমি মেবারের মহারাণা। তোমার কি সাজে এ-হেন রুক্ষ স্বর—তার উপর অকারণে ?

ভোজরাজ : অকারণ—? কিন্তু যাক্—কথায় কথায় শুধু কথাই বাড়ে। বলো—কী বলতে চাও।

উদয়বাই (একটু চুপ করিয়া থাকিয়া) : বলতে চাই—রাজার একটি মহৎ কর্তব্য—ক্ষমা করতে জানা।

ভোজরাজ (সশ্লেষে) : তথা—সাপকে দুধকলা দিয়ে পোষা। এই তো ?

উদয়বাই (নরম স্থরে) : অবুঝ হোয়ো না, রাজ! বিক্রম শুধু ঠাট্টা ক'রেই বলেছিল—

ভোজরাজ (পরুষ কণ্ঠে) : ঠাট্টা ? রাজরাণীকে এসে বলা যে তার চরিত্র নিয়ে পাঁচজনে বলাবলি করছে—এর নাম—

উদয়বাই : ছী ভাই! মিটমাট করবার যখন পথ আছে তখন মনকষাকষি কি ভালো ? বিক্রম যখন সত্যিই মীরার মনে ব্যথা দিতে চায় নি—চাইবে কেনই বা ?—তবে পাঁচ জনে পাঁচ কথা বলছে তাই জানাতে এসেছিল, ভালো ভেবেই, যাতে সে সাবধান হয়। অশোভন কিছু দেখলেই লোকে নিন্দে না ক'রে থাকতে পারে না—এ তাদের স্বভাব, জানো না কি ?

ভোজরাজ (তীক্ষ্ণকণ্ঠে) : জানি হয়ত আরো অনেক কিছু। যথা, কারুর কারুর আবার এমনি স্বভাব যে কুৎসাকে কুৎসিত বললেও নিন্দুকদের স্বপক্ষে তারা প্রাণপণে ওকালতি না ক'রে থাকতে পারে না।

উদয়বাই (ঈষৎ উষ্মার সঙ্গে) : এ তোমার সুবিচার হচ্ছে না রাজ! যাদের মাথা বেশি উঁচু তারা পাঁচজনের দৃষ্টি আকর্ষণ করবেই। চাঁদের কপালে তিলপ্রমাণ কলঙ্কও দেখা দেয় তাল হ'য়ে।

ভোজরাজ : "উপমা কালিদাসস্য"—না ব'লে "উপমা রাজকন্যায়াঃ" বললেই ঠিক হ'ত। (শ্লেষ ছাড়িয়া গম্ভীর স্থরে) এত বুদ্ধি ধরো, কেবল

এইটুকু বুঝতে বেগ পাও যে, কালোকে কালো ব'লে সনাক্ত করা আর শাদাকে কালো ব'লে রটানো এক জিনিস নয় ?

উদয়বাই (সুর নামাইয়া) : মীরার স্বভাব কালো এতটা কেউ বলে না, কিন্তু একটু বুঝতে চেষ্টা করো : সব কিছুরি একটা সীমা আছে। মাত্রা ছাড়িয়ে গেলে লোকে করবে না সমালোচনা ? বলবে না—এ বাড়াবাড়ি ?

ভোজরাজ (বিরক্ত) : বলতে চাও কি—ওরা নিরপেক্ষ হ'যে সমালোচনা করছে—শুধু বাড়াবাড়ির ? মীরার সম্বন্ধে বিক্রম কী বলেছে জানো না তুমি ? এটা ভালো ওটা মন্দ এ নিয়ে বিচার করবার অধিকার সবারই আছে কে না মানবে ? কিন্তু মীবা স্বামীকে ছেড়ে রাতের পব রাত মন্দিরে কাটায় কেন না মন্দিরে গোপালের চেয়ে একটু বেশি-জীবন্ত কেউ বিরাজ করে—এর নাম সমালোচনা ? আর একথা ও বলতে পারল মীরার কাছে ?

উদয়বাই : তুমি এই শাদা কথাটা কেন বুঝতে চাইছ না রাজ, যে প্রিবপরিজনের নিন্দে অষ্টপ্রহর শুনতে শুনতে যে-কোনো মানুষ হ'যে ওঠে অতিষ্ঠ। নৈলে বিক্রম এ-ধরনের নোংরা কথা কেনই বা মুখে আনবে বলো ? শোনো, অধীর হোয়ো না লক্ষীটি ! মীরা গোপালকে নিয়ে যে-ধরনের আধিখ্যেতা করে—দিনের পর দিন সবার সামনে নাচে গায়—রাতের পর রাত স্বামীর কাছছাড়া হ'য়ে মন্দিরে কাটায় একলা—অন্য কেউ হ'লে হয়ত এ-নিয়ে এত কথা উঠত না—কিন্তু রাণীর স্বধর্ম কি সেবাদাসী হওয়া, না পতিব্রতা ?

ভোজরাজ (উদ্দীপ্ত) : সেবাদাসী ? মীরা ? এমন কথা যে মুখে আনতে পারে তার সঙ্গে কোনো আলোচনাই হ'তে পারে না। (সুর নামাইয়া) শোনো উদা ! অপ্রিয় কথা বলা তোমার স্বধর্ম কি না জানি

না—কিন্তু রাজার স্বধর্ম যে শাসন করা এটুকু সবাই জানে ও মানে। তাই তোমাকে একটু সাবধান ক'রে দিচ্ছি—যে, অপরের শুদ্ধি নিয়ে এত বেশি মাথা না ঘামিয়ে আগে নিজের হিংসুক প্রকৃতিকে একটু শোধরালে তোমারও ভালো—পাঁচজনেরো উপকার।

উদয়বাই (আহত) : বিক্রম ঠিকই বলে : মীরাই তোমাকে করেছে অন্ধ, নইলে তুমি দেখতে পেতে যা জ্বল্ জ্বল্ করছে।

ভোজরাজ : আমার চোখ খোলা না অন্ধ—সে নিয়ে আমি তাদের সঙ্গে বাগ্‌বিতণ্ডা করতে রাজি নই যারা স্বভাবে নীচ ও মিথ্যুক।

উদয়বাই (কাঁদিয়া ফেলিয়া) : এমন কথা তুমি বলতে পারলে বড়বোনকে ?

উদয়বাই চক্ষে ওড়না টানিতেই ভোজরাজ তাহার দিকে পিছন করিয়া রুষ্টমুখে হ্রদের দিকে চাহিয়া রহিলেন। ঠিক্ এই সময়ে মীরা ফুলের সাজি হাতে মন্দির হইতে বাহির হইয়াই উদয়বাইকে দেখিয়া ছুটিয়া আসিলেন

মীরা (পিছন হইতে) : দিদি, জানো ? (আর এক পা অগ্রসর হইয়া) একী ? কাঁদছ কেন দিদি ?

উদয়বাই (তীক্ষ্ণ কণ্ঠে) : থাক্ থাক্, ঢের হয়েছে—মনে বিষ, মুখে সোহাগ ! (মুখ তুলিয়া ভোজরাজকে) আমি আজই চ'লে যাব চিতোর —বিক্রমকে নিয়ে।

মীরার পাশ কাটাইয়া দ্রুতবেগে প্রস্থান

মীরা (স্তম্ভিত হইয়া খানিকক্ষণ চুপ করিয়া থাকিয়া) : কী হয়েছে রাজ ?

ভোজরাজ (ফিরিয়া তাচ্ছিল্যের সুরে) : এমন কিছু না। শুধু ওকে একটু জানিয়ে দিতে হ'ল যে স্বাস্থ্যরক্ষার জন্যে সময়ে সময়ে

পাঁচন দরকার হয়। (উষ্মার স্বরে) এই সব মৎলবী, পরশ্রীকাতরের দল—যারা মুখের সাম্‌নে করে স্তব, আড়ালে রটায় কুৎসা—

মীরা (অনুযোগের স্বরে): ছী, রাজ! উনি যা-ই হোন তোমার বড় বোন—মনে রেখো। তাছাড়া হয়ত উনি ভালো ভেবেই বলেছিলেন—তুমি ভুল বুঝেছ—

ভোজরাজ: মীরা! স্বভাবে-উদার যারা—তারা কোনোদিনই পারে না নীচতার তল পেতে। ওরা ভালো ভেবে তোমার সম্বন্ধে অকথ্য কুৎসা রটায়—ঈর্ষায় জ্ব'লে পুড়ে খাক হ'য়ে গেল যারা? ওদের মুখ দেখলেও প্রায়শ্চিত্ত করতে হয়। (পরুষ কণ্ঠে) তার উপর আমাকে ভয়-দেখানো যে, ওঁরা, পুণ্যবান্ পুণ্যবতী, চ'লে যাবেন আমাদের এ-পাপ-পুরী ছেড়ে! (তারস্বরে) যাক্ না, এক্ষনি দূর হোক্, আমি রাজবাড়িতে দেয়ালি দেব—ধূপ ধুনো দিয়ে, শাঁক বাজিয়ে।

মীরা: এমন কথা বলতে নেই রাজ! ওরা যা-ই করুক না কেন, তোমার আপনার জন। ওদের তাড়িয়ে দেবে—এতে আমার একটুও সায় নেই।

ভোজরাজ (বিরস কণ্ঠে): তবে চলুক এই রকম কুৎসা নিন্দা ষড়যন্ত্র—

মীরা: না। এ থাকবে না। ভক্তকে ভগবান দেখেন, কেবল বাজিয়ে নিয়ে তবে। মনে রেখো, সীতা-যে-সীতা তাঁকেও দিতে হয়েছিল অগ্নিপরীক্ষা। এ আমার কথার কথা নয় রাজ! গোপাল বলে: বাইরের থেকে আঘাত আসে আমাদের শুধু পরীক্ষা করতেই নয়—নিখাদ করতে। ওরা আমার নিন্দে করলে আমাকে বাজে, স্তব করলে আমি খুশি। দুটোই দুর্বলতা—বলে গোপাল। তাই বলো ওদের থাকতে—লক্ষ্মীটি!

ভোজরাজ (প্রশংসমান দৃষ্টিতে মীরার দিকে তাকাইয়া): এ তোমারি যোগ্য কথা মীরা!…কেবল…ভেবে দেখো…দিনের পর দিন পারবে তো সইতে? যতটা ভার আমাদের মেরুদণ্ড সইতে পারে তার চেয়ে একটু কম ভারেব বোঝা-বওয়াই নিরাপদ নয় কি? তাছাড়া একটা কথা তুমি ভুলো না: ওরা শুধু বেদরদীই নয়—ওরা স্বভাবে কুচক্রী, পরশ্রীকাতর। এমন দুর্জনকে সময থাকতে বিদায় দেওয়াই কি ভালো নয়?

মীরা: সব সময়ে নয় রাজ! তুমি জানো সস্তা সুখ—কর্পূর, একটু গন্ধ বিলোতে না বিলোতে যায় উবে। তুমি আমি চাই মৃগনাভি—যদি সারা বন ঢুঁড়তে হয়—তাহ'লেও। (একটু চুপ করিয়া) এ আমাব মুখের কথা নয় বাজ, অন্তরেব প্রার্থনা। অভিমান আমার বড় বেশি। তাকে জয় না করলে নিরভিমান গোপাল দাঁড়াবে কোন্ ভিৎ-এ? আর, অপ্রিয় কোনো কিছু থেকে পালিয়ে তাকে জয় করা যায় না—তার মুখোমুখি হ'তে হয়। (একটু চুপ করিয়া জলভরা চোখে ভোজরাজের দিকে চাহিয়া) শুধু দুঃখ এই যে, আমার জন্যে তোমাকেও কত কী সইতে হচ্ছে—

ভোজরাজ (বাধা দিয়া): আমি আমার কথা ভেবে ওদের ভাগাতে চাই নি মীরা, বিশ্বাস কোরো। (এক পা অগ্রসব হইয়া মীরার দুই হাত নিজের হাতের মধ্যে টানিয়া) তোমাকে সুখী করতে পারি এমন সৌভাগ্য নিয়ে আমি জন্মাই নি—কিন্তু যদি তোমাকে মিথ্যে অশান্তির হাত থেকেও বাঁচাতে না পারি তবে সে-দুর্ভাগ্যের কোথায় সান্ত্বনা বলো তো?

মীরা (অশ্রুগাঢ় কণ্ঠে): এমন কথা কেন বলছ, রাজ? দুর্ভাগ্য তো তোমার নয়—আমার, যে আমিই পারি নি তোমাকে তৃপ্তি দিতে।

শুধু তাই নয়··(বিষণ্ণ কণ্ঠে) আমি যে জন্ম-অপয়া—যেখানেই যাই আনি ঝড়তুফান, কালো মেঘ।

ভোজরাজ (কোমল ভর্ৎসনার সুরে): ছি ছি—এমন কথা মুখে আনে! তুমি অপয়া—তুমি—রাজপুতের কুললক্ষ্মী, মেবারের মুকুটমণি!

মীরা (তাঁহার দৃষ্টি এড়াইয়া): কেন ছেলেভুলোনো সান্ত্বনা দিচ্ছ, রাজ?—যখন···যখন তুমি ভালো ক'রেই জানো আমি তোমাকে বিবাহ করা সত্ত্বেও ভাগ্যদোষে পারিনি তোমার (থামিয়া·)—স্ত্রী হ'তে।

ভোজরাজ (মীরার কণ্ঠবেষ্টন করিয়া): তোমার ভাগ্যকে দূষছ কেন মীরা—যখন ··যখন তুমি নিজে তা চাও নি যা আমি চেয়েছিলাম? কাজেই ক্ষতি তো তোমার নয়—একা আমারি।

মীরা (ক্লিষ্ট কণ্ঠে): তুমি কী বলছ, রাজ? আমি গোপালকে ভালোবেসেছি ব'লে কি মানুষ নই? তোমার ম'ত স্বামী কজন পায়? রূপে, গুণে, বিদ্যায়, বীর্যে, মহত্ত্বে—কজন পারে তোমার সঙ্গে প্রতিযোগিতা করতে? তাই তো···(একটু চুপ করিয়া থাকিয়া)···আমাকে এত বাজে যখন আমি ভাবি—তোমার যা প্রাপ্য স্বামীর সহজ অধিকারে, তাও তুমি চাও নি শুধু স্ত্রীর কথা ভেবে।

ভোজরাজ (মীরার দিকে একদৃষ্টে তাকাইয়া): একটা কথা যদি বলি বিশ্বাস করবে মীরা?

মীরা: এমন কথা কেন বলছ রাজ! তোমার সত্যনিষ্ঠা তোমার শত্রুরও চোখে পড়ে—

ভোজরাজ (জোর করিয়া উচ্ছ্বাস দমন করিয়া): মীরা! আমি স্বভাবে উচ্ছ্বাসী; কিন্তু অসংযমী নই। আমি ভগবান্ মানি না—গীতা ভাগবত বুঝি না—কিন্তু চিনি মহত্ত্বকে, সম্মান করি শুচিতাকে। তুমি কি জানো তুমি আমাকে কী দিয়েছ?

মীরা : জানি—লোকনিন্দা-সওয়ার দুঃখ।

ভোজরাজ : না মীরা! লোকনিন্দা আমাকে একটুও বাজে নি—বলব না। কিন্তু একথা অকপটেই বলতে পারি যে সে-দুঃখও আমাকে বেজেছে বিশেষ ক'রে তোমার কথা ভেবে—তুমি এতে মনঃকষ্ট পাও ব'লে। কিন্তু যে-কথা আমি বলতে চেয়েছিলাম সে এ নয়। আমি বলতে চেয়েছিলাম—তুমি আমাকে দিয়েছ দুঃখ গ্লানি নয়—দিয়েছ মহৎ হবার সুযোগ। তুমি জানো—ভগবান্ আমি মানি না—আর যাঁকে চিনি না তাঁর কাছে নত হবার কথা ভাবতেও পারি না। কিন্তু··· আশ্চর্য এই যে, সময়ে সময়ে আমার এ-হেন উদ্ধত স্বভাবও—কার কাছে জানি না—কৃতজ্ঞতায় নুয়ে পড়ে এই ভেবে যে তুমি এসেছিলে আমার জীবনে—যার ফলে আমার কালো মনও আলো হ'য়ে উঠেছিল শ্রদ্ধার সূর্যোদয়ে—আমার স্বভাব-সন্দিগ্ধ বুদ্ধিও অঙ্গীকার করেছিল—ভগবানকে না হোক—পুণ্যকে, পবিত্রতাকে, মহত্ত্বকে। আমার মধ্যে ভালো যেটুকু—ফুটে উঠেছে দিনে দিনে তোমারি চাহনিতে, আর মন্দ যা কিছু নিরস্ত হয়েছে তোমারি স্নেহস্পর্শে। তাই তো তুমি আমার নিত্যসাথী হ'য়েও শয্যাসঙ্গিনী হও নি—এজন্যে আমার মনে ব্যথা থাকলেও দুঃখ নেই। কারণ প্রবৃত্তি আমার প্রবল হ'লেও আমি যে পেরেছি আমার প্রতিজ্ঞা বজায় রাখতে এতে আমি নিজের চোখে উঠেছি বড় হ'য়ে। এত বড় লাভের পাশে এমন কোন্ ক্ষোভ আছে যা ম্লান হ'য়ে না যায়?

মীরা (ম্লান কণ্ঠে) : এতে তোমার ক্ষোভ কাটতে পারে, কিন্তু আমার?—না রাজ, এ আমার সস্তা উচ্ছ্বাস নয়। আমাকে সবচেয়ে বাজে কোথায় জানো? তোমার কাছে অঢেল পেয়ে তবু কোনো প্রতিদান দিতে পারি নি ব'লে—যা প্রতি স্ত্রী দেয় সর্বান্তঃকরণে, সগৌরবে। (দীর্ঘনিশ্বাস) কিন্তু ভবিতব্য কে খণ্ডাবে? (ভোজরাজের কাঁধে হাত

রাখিয়া) শুধু একটি সান্ত্বনা আমার আছে : আমি তোমাকে প্রতারণা করি নি—আংটিবদলের দিনই বলেছিলাম তোমাকে আমি কী দিতে পারব —কী পারব না! কিন্তু সান্ত্বনায় তো শান্তি নেই রাজ! তাই থেকে থেকে মন আমার ব্যথায় আজো কালো হ'য়ে আসে যে আমাকে আসতে হ'ল তোমার ম'তন স্বামীর কাছে—লাভের, গৌরবের জয়টিকা হ'য়ে না, ক্ষতির, লোকনিন্দার কণ্ঠমালা হ'য়ে।

ভোজরাজ (সাদরে) : লোকনিন্দার কথা কেন বার বার তুলছ, মীরা? লোকের কথায় কী আসে যায়—যারা আজ যা বলে কাল ভোলে, যা রটায় তার নিহিতার্থ জানে না, যা প্রত্যহ দেখে তাকেও বোঝে ভুল? তাই মন থেকে মুছে ফেলে দাও তাদের কথা যারা স্থূলের বিচারে সূক্ষ্মের এজাহারকে পাশ কাটিয়ে চলে। (মীরার করচুম্বন করিয়া) আর বিশ্বাস কোরো একটি কথা—ভূগর্ভে যে-সব কীটের বসতি তারা আলো-কে শাপমন্যি দিলেও আলোয় যাদের সহজবিকাশ তারা জানে তুমি কী বস্তু। বিক্রম বা উদা-র ম'তন হিংসুকরা তোমার কুৎসা রটিয়ে আনন্দ পায়—একথা সত্য, কিন্তু সঙ্গে সঙ্গে এ-ও কি সমান সত্য নয় যে, সারা ভারতে তোমার নাম ছড়িয়ে পড়েছে? কত সাধু, সন্ত, ভক্তিমন্ত তোমার নাম করে, গান গায় তুমি খবর রাখো না কিন্তু আমি তো জানি। জানো—কত লোকে আমাকে উচ্ছ্বসিত চিঠি লেখে তোমার সম্বন্ধে? "জনম মরণকে সাথী", "মীরাকে প্রভু গিরধর নাগর", "চাকর রাখো জী"—ধরনের চরণ ইতিমধ্যেই হ'য়ে উঠেছে প্রায় প্রবাদ-বাক্যের সামিল। ঘরে ঘরে লোকে বলে সগৌরবে "গোবিন্দ লীনো মোল" একথা বলতে পারে কেবল সেই ভাগ্যবতী যার উপাধি—"দাসী মীরা জনম জনমকী"।

মীরা (ম্লান হাসিয়া) : মানুষ যখন ছোটে সান্ত্বনা দিতে তখন কী যে বলে খেয়াল থাকে না বোধ হয়, না? নৈলে তুমি কেমন ক'রে

বলতে পারলে—সবাই সগৌরবে জয়ধ্বনি করে "মীরা দাসী জনম জনমকী" ব'লে? প্রভুকেই অবিশ্বাস ক'রে উড়িয়ে দিয়ে দাসীকে নিয়ে সুরু করলে উচ্ছ্বাস!

ভোজরাজ (মৃদু হাসিয়া): মীরা! আমাদের ম'তন ঐহিক মানুষকে বুঝতে তুমি এত বেগ পাও কেন বলব?—কারণ তুমি এসেছ এ-পৃথিবীর অতিথি হ'য়ে, বাসিন্দা হ'য়ে না। (মীরার চিবুক ধরিয়া গাঢ়কণ্ঠে) তবে হয়ত ঠিক সেই জন্যেই তুমি আমাদের জড়তার রাজ্যে বহন ক'রে এনে দাও যাদের নাম নেই কিন্তু গন্ধ আছে, ভার নেই কিন্তু আলো আছে। তাই তো তোমাকে ধরতে যাই কিন্তু পারি না ছুঁতে··· অথচ আশ্চর্য এই যে না-পাওয়ার মধ্যে দিয়েও কেমন ক'রে যেন পাই তোমাকে! এ আমার কথার-কথা নয় মীরা! জানো, আজই খানিক আগে যখন জলভরা চোখে তুমি গাইছিলে "আমায় রেখো হে তব অধীন"—তখন আমার কী মনে হচ্ছিল? মনে হচ্ছিল—তুমি এত কাছে থেকেও দূরে রইলে ব'লেই হয়ত তোমার মধ্যে দিয়ে পাই এমন-সব আভাস—যা পেতাম না তোমাকে বাঁধাধরার মধ্যে পেলে···হয়ত তোমাকে বেশি কাছে পেলে পারতাম না সইতে!—না শোনো—যদিও আমি কেন আজ বলছি এসব কথা জানি না। শুধু এইটুকু জানি যে, তোমার কাছে যা পেয়েছি তার হয়ত কিছু হিসাব পেলেও পেতে পারি, কিন্তু যা পাই নি তার মধ্যে দিয়ে কী পেয়েছি ও শিখেছি তার খবর পেতে বহুদিন লাগবে। কে জানে, হয়ত তোমাকে হারিয়েছি ব'লেই তোমাকে খানিকটা অন্তত চিনতে পেরেছি—তোমাকে পেলে হয়ত ফেলতাম হারিয়ে!

মীরা (স্থির দৃষ্টিতে চাহিয়া): একথা তুমি কি সত্যি সম্ভব ব'লে বিশ্বাস করো?

ভোজরাজ : পুরোপুরি বিশ্বাস আমাদের ম'তন স্বভাব-সন্দিগ্ধ মনের নাগালের বাইরে, কিন্তু বিশ্বাসের কিছু পাথেয় হয়ত পেয়ে থাকব—নৈলে আমার প্রতিজ্ঞা রাখতে পারতাম না। কারণ কতবারই তো আমার বাসনা করেছে বিদ্রোহ, কিন্তু রুখে উঠেও পারিনি কেন তৃষ্ণার জলকে অধিগত করতে?

মীরা (সগর্বে) : তুমি মহৎ ব'লে।

ভোজরাজ : না : তুমি তুমি ব'লে। নৈলে কি ভগবান্ না মেনেও পারতাম ভক্তিমতীর কাছে নত হ'তে? (একটু চুপ করিয়া) একটা কথা তুমি আজো জানো না। রাতের পর রাত তুমি করেছ গান মন্দিরে—আমি শুনেছি বাইরে থেকে লুকিয়ে। তুমি করেছ গোপালের উচ্ছল স্তব—আমি করেছি তোমার নীরব পূজা। অথচ আমার চোখে ঘুম আসে নি। কেন?

মীরা (সবিস্ময়ে) : তুমিই বলো।

ভোজরাজ : কারণ ভগবানকে স্বীকার না ক'রেও তোমার ভক্তিকে না মেনে পারি নি, তোমার বিশ্বাস বা দর্শনকে গ্রহণ করতে না পেরেও তোমার সরলতায়, তোমার সত্যনিষ্ঠায় মুগ্ধ হয়েছি। মনের মধ্যে প্রশ্ন জেগেছে—জল না থাকলে কি তৃষ্ণা জন্মাত? বুদ্বুদের বীজে কি বনস্পতি গজায় কখনো? পাইনি আজো এ-প্রশ্নের উত্তর—অথচ সেই না-পাওয়ার মধ্যে দিয়েও কিছুই-যে পাই নি এমন কথাই বা বলি কেমন ক'রে—যখন দেখি সংশয় না কাটলেও হৃদয়ের হয়েছে কত-যে গ্রন্থিমোচন—প্রভুকে নামঞ্জুর ক'রেও নত না হ'য়ে পারি নি তাঁর "জনম জনমকী দাসী"-র কাছে! তাই বলি—

মীরা : শ্—শ্—শ্। বিক্রম।

বিক্রমের প্রবেশ

ভোজরাজ অপ্রসন্ন মুখে বিক্রমের দিকে পিছন ফিরিয়া হ্রদের দিকে
চাহিয়া রহিলেন, মীরা মাটি থেকে ফুলের সাজি
তুলিয়া প্রাসাদের দিকে ফিরিলেন।

বিক্রম (মীরার পথরোধ করিয়া করুণ কণ্ঠে) : দিদি! যে অনুতপ্ত তাকেও করবে না ক্ষমা ?

মীরা (বিরস কণ্ঠে) : আমার ক্ষমা নিয়ে তুমি করবে কী ?

বিক্রম : নিয়ে করব কী ? বলো—না পেলে করব কী ? কাল রাতে তোমার গোপাল আমাকে দিয়েছেন যে কী শাস্তি—!

ভোজরাজ (ফিরিয়া) : বাজে কথা রাখো। তোমার ম'তন জঘন্য জীবের মতিগতি নিয়ে গোপাল মাথা ঘামান না।

বিক্রম (নতশিরে) : তিরস্কার করো যত ইচ্ছা। কিন্তু তবু দিদির ক্ষমা ছোটভাইয়ের চাইই চাই। (অশ্রুগাঢ় কণ্ঠে) বলো দিদি, বলো ক্ষমা করেছ—নৈলে—(মীরার পায়ে লুটাইয়া পড়িয়া)—নৈলে আমি আত্মহত্যা করব—আমি যে সইতে পারছি না আর—

মীরা (মুহূর্তে সব ক্ষোভ ভুলিয়া নত হইয়া বিক্রমের মাথায় হাত রাখিয়া) : ও কী ভাই ? ক্ষমা আবার কী ? ওঠো। (তাহার দুই বাহু ধরিয়া তুলিয়া) আমি ক্ষুব্ধ হয়েছিলাম—সত্য। কিন্তু লঘুপাপে তোমার এই গুরুদণ্ডে—সত্যি বলছি—আমার সব ক্ষোভ জল হ'য়ে গেছে।

বিক্রম (কম্পিত কণ্ঠে) : দণ্ড ব'লে দণ্ড দিদি! সে যে কী নরক-যন্ত্রণা যদি জানতে! (দুই হাতে মুখ ঢাকিয়া) কিন্তু আমি যে জানতাম না দিদি তুমি কে!

কান্নায় ভাঙিয়া পড়িল

ভোজরাজ (তাহার কাঁধে হাত রাখিয়া) : হয়েছে, হয়েছে। পুরুষ-মানুষ হ'য়ে কাঁদে! মুখ তোলো। বলো—কী ব্যাপার—আমরা চাই শুনতে।

বিক্রম (কান্না দমন করিয়া, মুখ তুলিয়া) : উঃ! সে বলতে গেলেও যেন মাথা ঘোরে। (কণ্ঠ পরিষ্কার করিয়া) কাল সন্ধ্যাবেলা মন্দিরের এক কোণে ব'সে উদা ও আমি চাপা সুরে দিদিকে নিয়ে হাসাহাসি করছিলাম এমন সময়ে দিদি একটি গান ধরলেন। উদা বলল হেসে: "কত ঠাটই না জানেন!" আমি হেসে বললাম: "নষ্ট মেয়ের ঠাট ঠমক না জানলে চলে, উদা?" আরো কী বলতে যাচ্ছিলাম এমন সময়ে চক্ষের নিমেষে কী ঘ'টে গেল—মনে হ'ল মন্দিরের মাটি উঠল কেঁপে—যেন ভূমিকম্পে! সঙ্গে সঙ্গে দেখলাম—যেখানে গোপালের বিগ্রহ ছিল সেখানে দাঁড়িয়ে এক করালী মূর্তি—এক হাতে খাঁড়া, অন্য হাতে বল্লম। (থরথর করিয়া কাঁপিয়া) উঃ!—তার উপর সে কী খল্ খল্ হাসি!...তারপর সে-মূর্তির মাথা দেখতে দেখতে ঠেকল মন্দিরের ছাদে। আমি চিৎকার ক'রে উঠতেই সে ধেয়ে এল আমাদের কাছে ও এক হাতের বল্লম দিল উদা-র বুকে বিঁধিয়ে, অন্য হাতের খাঁড়া দিয়ে কেটে ফেলল আমার মাথা। আমি স্বচক্ষে দেখলাম আমি কবন্ধ আর আমার মুণ্ড ঘরের এ-কোণ থেকে ও-কোণে আবার ও-কোণ থেকে এ-কোণে ফিরে আসছে গড়িয়ে গড়িয়ে। আর সে কী অট্টহাসি—(উন্মত্তবৎ) হাঃ হাঃ হাঃ হাঃ হাঃ হাঃ—

মীরা সভয়ে সরিয়া গেল, ভোজরাজ বিক্রমের কাছে আসিলেন।

ভোজরাজ (বিক্রমের দুই বাহু ধরিয়া ঝাঁকুনি দিয়া) : বিক্রম—বিক্রম—

বিক্রম (চিৎকার করিয়া) : মাথা গেল—মাথা গেল—রক্ষা করো মা!—কেটে ফেলো না—আর কখনো এমন—

পতন ও মূর্ছা

মীরা (মাটিতে বসিয়া বিক্রমের মাথা কোলে তুলিয়া) : বৈদ্যকে ডেকে পাঠাও এক্ষনি—

ভোজরাজ (অবিচলিত কণ্ঠে) : হচ্ছে। আগে ওকে—

তাঁহার কথা শেষ হইবার পূর্বেই চিৎকার শুনিয়া তিনজন দৌবারিক মালীর সহিত ছুটিয়া আসিল হাজিরি দিতে

ভোজরাজ : এ'কে ধরাধরি ক'রে নিয়ে গিয়ে শুইয়ে দিয়ে রাজবৈদ্যকে তলব করো। (মীরাকে) তুমি কোথা যাচ্ছ ?

মীরা : একটু দেখি—

ভোজরাজ : না, ওকে দেখবার লোক ঢের আছে—তুমি থাকো—কথা আছে।

দৌবারিকগণ ও মালীতে মিলিয়া বিক্রমকে ধরাধরি করিয়া লইয়া গেল

মীরা : কী কথা রাজ ?

ভোজরাজ : এমন কিছু নয়। কেবল একটু সাবধান ক'রে দেওয়া—যে, ও ভয় পেয়ে যা বলছে ভয় কেটে গেলে তা বলবে না—ধরবে ফের নিজমূর্তি।

মীরা : তুমি এমন কঠিনও হ'তে পারো রাজ—!

ভোজরাজ : কঠিন না—সতর্ক। আমি ওকে তোমার চেয়ে বেশি চিনি। ও মানুষ যে খুব মন্দ তা নয়। কিন্তু অপদার্থ—ছেলেবেলা থেকেই। মতলবী যে-কেউ ওকে নাকে দড়ি দিয়ে ঘোরাতে পারে। তাই না ওর এই দশা! ও একেবারে উদা-র মুঠোর মধ্যে।

মীরা : তাহ'লে তো ও আরো দুঃখী, রাজ! আহা ওকে ক্ষমা করো—ভুলে যাও অন্ধের অপরাধ।

ভোজরাজ : ক্ষমায় আমার আপত্তি নেই—কিন্তু ভুলে-যাওয়া কোনো

কাজের কথা নয়। বহুরূপী ক্ষণে ক্ষণে রঙ বদলায়—সকালে গোলাপী, দুপুরে নীল, বিকেলে হয়ত বা মিশ্‌কালো। যারা বিক্রমের ম'তন স্বভাবে চঞ্চল ও সংকল্পে দুর্বল তারা ঠিক্ এমনিই রঙ বদলায় ঘণ্টায় ঘণ্টায়। কেবল ওর একটা কথা শুনে ওর সম্বন্ধে আমার একটু আশা হয়েছে: "আমি যে জানতাম না দিদি, তুমি কে!" যদি এই ভাবটির রঙে ওর মন রঙিয়ে ওঠে তবেই ওর মুক্তি।

মীরা: আমাকে এমন ক'রে বাড়িয়ো না রাজ! গোপাল প্রায়ই বলে আমাকে সাবধান করতে যে, আত্মাদরের অন্ধকারকে যে পোষে—করুণার আলো তার মধ্যে ঠাঁই পায় না। বলে: সর্বদা মনে রাখা চাই যে বড় হয় সে-ই যে ছোট হ'তে জানে।

ভোজরাজ (বিরস কণ্ঠে): এবার আমাকে ফেললে তুমি অথই জলে। করুণা আমার কাছে শোনা-কথা। কোনো কিছুকেই আমি মেনে নিতে পারি না বাইরের নজিরে—গুরুবাক্যে বা শাস্ত্রের সাক্ষ্যে। শ্রদ্ধা মহত্ত্ব ত্যাগ পবিত্রতা—এসবে আমার অন্তরের তার বেজে ওঠে—এদের আমি চিনি। কিন্তু ভাগবত করুণার কোনো চিহ্নই আমি দেখতে পাই নি এ-জগতে। (ব্যঙ্গভাসে) করুণা ব'লে কোনো দেবী যদি এ-জগতে বসবাস করতেন তাহ'লে কি মানুষ আজও ভিতরে ভিতরে থাকত পশুর চেয়েও নিঠুর, সাপের চেয়েও খল? না মীরা, এখানে আমাকে ক্ষমা করতেই হবে। "অন্ধ বিশ্বাস" কথাটা শুনলেই আমার মন শিরপা তোলে: এ-জগতে প্রত্যক্ষ ভূতপ্রেতের যে দুর্দণ্ড প্রতাপ প্রতিদিন চাক্ষুষ করা যায় তার পরে গদ্‌গদকণ্ঠে কোনো অদৃশ্য কারুণিক ভূতের ওঝার জয়গান করতে আমার বাধে।

মীরা (ক্লিষ্ট কণ্ঠে): চাইলেই যে-সম্পদ পাওয়া যায় তাকে "চাই

না” ব’লে যদি ফিরিয়ে দাও তবে আর কী বলব বলো? যেটুকু জানি বা চোখে দেখতে পাই তার বেশি জানতে বা দেখতে চাইব না—এ-যুক্তি যে জোগায় তার নাম আর যাই হোক শুভবুদ্ধি নয়। শিশু তো কিছুই জানে না তার স্বার্থ ও অভাব ছাড়া। অনেক চেষ্টায় তবে তাকে শিখতে হয় বিদ্যা, হ’তে হয় সংযমী। জিজ্ঞাসা যার নেই তার জ্ঞানও নেই। সাধনা বিনা নবীন হয় না প্রবীণ—আর প্রবীণকে দিনে দিনে অনেক কিছুই মানতে হয় যা শিশুর কাছে অগ্রাহ্য। গোপাল একটি কথা বলে প্রায়ই: যে, বুঝতে-পারি-না-র পিছনে গাঢাকা দিয়ে থাকে বুঝতে-চাই-না।

ভোজরাজ (একটু ভাবিয়া): হয়ত তুমিই ঠিক, আমিই ভুল পথে চলেছি। কিন্তু…(একটু থামিয়া মাথা নাড়িয়া) কী করব—শাস্ত্র বা গুরুবাক্যের নজিরে কোনো কিছুকে অন্ধভাবে বিশ্বাস করতে আমার মন পারে না—বা চায় না যা-ই বলো। হয়ত করুণা ব’লে কোনো নিস্তারিণী আছেন এ-জগতে…তবু করুণার জয়গান করতে আমার আত্মসম্মানে বাধে—বিশেষ ক’রে এই জন্যে যে, করুণাকে অন্ধভাবে গড় না করলে তিনি এমন কি মুষ্টিভিক্ষাও দিতে চান না।

মীরা (একদৃষ্টে ভোজরাজের দিকে চাহিয়া): আমার দুঃখ হয় ভাবতে—কিন্তু যাক্। (দীর্ঘনিশ্বাস ফেলিয়া) গোপাল বলে—সব কিছুরি একটা সময় আছে। আমি প্রার্থনা করব—যেন তোমার আসে সেই সুদিন যেদিন তাঁর করুণার সঙ্গে হবে তোমার শুভদৃষ্টি। কারণ ভগবান্ করুন, সে সুলগ্ন এলে চোখের ঠুলি তোমার পড়বেই খ’সে, দেখতে পাবে—কোন্-সে মিথ্যে গর্বের মোহে প’ড়ে আমরা হাতের লক্ষ্মী পায়ে ঠেলি। না রাজ, এ-তর্কবিচারের কথা নয়—এ যে আমি জেনেছি

অনেক দুঃখের দাম দিয়ে তবে। তাই তো আমি গাইতে পেরেছিলাম গোপালের সুরে সুর মিলিয়ে :

নয়নের জলে তাই গাই : "করো আমারে বন্ধু, দীন,
যত অভিমান হোক নাথ, তব চরণধূলায় লীন।"

ভোজরাজ : চোখের জলে আমার আপত্তি নেই, আমার আপত্তি—

মীরা : জানি—দীনতায়। কিন্তু কেন এ-আপত্তি বলব? রাগ কোরো না রাজ! দীন হ'তে তোমার বাধে, কেন না তুমি জিজ্ঞাসু হবার আগেই চাও বিচারক হ'তে। কিন্তু জল জমে নিচু খেতেই—উদ্ধত শিখর থাকে শুক্‌নো, বন্ধ্যা। একজন বলে : "আমি একলাই থাকব, কারুর কাছে করব না মাথা হেট", আর একজন বলে : "আমি নত হ'য়ে চাই সবার সাথী হ'তে", করে প্রার্থনা :

(সুর করিয়া)

প্রতিভা, শকতি, গরব, বিভব
করো পদানত প্রণতি-নীরব,
হে ঘন-শ্যামল! অঝোর-বরষা হ'য়ে এসো তাপহরা।
বহুদুর্লভ তুমি, তাই ডাকি : "করুণায় দাও ধরা॥"

ভোজরাজ : থামলে কেন মীরা? গাও গাও—শুধু গাও। (মৃদু হাসিয়া) গীতা ভাগবত পাঠে নাস্তিক পূজারী হয় কি না জানি না। শুধু এইটুকু জানি যে, তোমার একটি গানে পাই—যা পাই না তোমার হাজারো বক্তৃতায়। তাই বলি : তুমি শুধু গান গেয়ে যাও—যদি সত্যিই চাও আমাকে তুলতে।

মীরা (ম্লান সুরে) : কে কাকে তোলে রাজ! মানুষের বিদ্যাবুদ্ধির

দৌড় কতটুকু বলো ? অথচ আশ্চর্য এই যে, এই দীন হীন মানুষই আবার তাঁর করুণা পেলে পারে বলতে :

গান

আজ কে প্রেমের তীরে এলো সখী, ধীরে ধীরে ?
বল্, কোন্ সে-অতিথি এলো আজ স্থলগনে ?
খুলি' নয়নের দ্বার হৃদয়ে আমার ফিরে
বল্ কোন্ সে অতিথি এলো রে মধুমিলনে ?

ছিল ঘুমায়ে স্বপন, কে তারে হেসে জাগালো ?
মধু- বনের সে-লীলা স্মরণে আজ রাঙালো ?
সেই বৃন্দাবনের মধুর গান শোনালো,
গেছে হারায়ে যে দিনগুলি—কে এসে ফিরালো,
বল্ কোন সে অতিথি এলো আজ স্থলগনে ?

নীল যমুনাপুলিনে সখীদের সেই মেলা,
যারা খেলিত শ্যামের সাথে লুকোচুরি-খেলা,
সেই কোকিলের গাওয়া কুঞ্জে সকালবেলা,
সাঁঝে তারায় আমার ভরিতে ডালি একেলা,
বল্ কোন্ সে-অতিথি এলো আজ স্থলগনে ?

বহে কল কল কল কালিন্দীর তরঙ্গ,
করে চল চল চল মনের মাঝে অনঙ্গ,
ধায় প্রাণ : চল্ চল্ বরিতে প্রিয়ের রঙ্গ,
ভর- 'বন্ধন টুটি' যে করে চির অসঙ্গ,
বল্ কোন্ সে-অতিথি এলো আজ স্থলগনে

আজি বিরহের রাতে কে জ্বালে শিখা অমল ?
সে কে প্রেমের ছোঁওয়ায় জাগায়ে করে উছল ?
হ'ল বেদনার কালো ছায়া আলোবিহ্বল,
মরি, অন্তরপুরে সুন্দর অপচল
বল্ কোন্ সে-অতিথি এলো আজ মুলগনে ?

উদয়বাইয়ের প্রবেশ

উদয়বাই : বিক্রমের খুব জ্বর…গা পুড়ে যাচ্ছে…

নিশ্চুপ

উদয়বাই (মীরাকে) : তোমাকে দেখতে চাইছে।

মীরা : চলো—

ভোজরাজ (বাধা দিয়া) : না।

উদয়বাই : ও ভুল বকছে। (সানুনয়ে) তোমাদের দুজনেরই নাম ধ'রে ডাকছে—

মীরা : আমাকে যেতে দাও রাজ, লক্ষ্মীটি !

ভোজরাজ (দৃঢ় কণ্ঠে) : না। (উদয়বাইকে) দেখা হবে বিকেল বেলা। এবেলা ও ঘুমোক। কথা এখন ওর বেশি না বলাই ভালো।

উদয়বাই : তুমি কি পাষাণ হ'য়ে গেলে, রাজ ?

ভোজরাজ : মাখম হ'লে যে তোমার নিশ্বাসে গ'লে যেতাম !

উদয়বাই (জ্বলিয়া, মীরার দিকে কটাক্ষ করিয়া) : যত নষ্টের গোড়া ইনি—ডুবে ডুবে জল খান—অলক্ষণা—

ভোজরাজ (সগর্জে) : চুপ্।

উদয়বাই (রুখিয়া) : চুপ ? কেন শুনি ?—মনে রেখো একটা

কথা : আমি মেবারের রাজকন্যা—ওর ম'ত তুচ্ছ তালুকদারের মেয়ে নই।

ভোজরাজ (সভ্রূভঙ্গে) : আর তুমিও মনে রেখো একটা কথা : যে, মেবারের মহারাণা আমি। (ক্রোধ দমন করিয়া সুর নামাইয়া) যাও আমার সামনে থেকে, তোমার মুখদর্শন করাও পাপ।

মীরা (উভয়ের মধ্যে আসিয়া) : ছী রাজ! বড় বোনকে—

ভোজরাজ (মীরাকে সরাইয়া উদয়বাইকে) : তুমি যখন তখন বড় গলা ক'রে বলো—তুমি স্পষ্টবাদিনী। তাই যাবার আগে দুটো স্পষ্টকথা শুনলেই বা—স্বাস্থ্যরক্ষা হবে। মীরা কেমন রাণী কেউ কেউ না জানতে পারে। কিন্তু তোমার ম'তন মেয়েরা যে কী বস্তু জানতে কারুর বাকি নেই—নীচ, ভণ্ড, কুচক্রী! মানি—তুমি জানো হিংসাকে কেমন ক'রে বিচারকের মুখোষ দিয়ে ঢাকতে হয়—কেবল এই শাদা কথাটি জানো না আজো যে, মুখোষ প'রে দুচারদিন লোকঠকানো যেতে পারে, কিন্তু আখের বজায় রাখা যায় না। কারণ মুখোষ একদিন না একদিন পড়েই খ'সে—বেরিয়ে পড়ে নিজমূর্তি। শোনো আরো একটা স্পষ্ট কথা : তোমাদের ম'তন পরশ্রীকাতর মেয়েরা দুর্বুদ্ধিতে পাকা হ'লেও, কল্পনায় ডাঁশাও নয়—একেবারে কাঁচা। তাই মনে করো—মীরার নামে লাগিয়ে লাগিয়ে আমার মন বিষিয়ে দিতে পারবে, ফন্দি আঁটো এই ভেবে যে, নাস্তিক পাবে না আস্তিককে বরদাস্ত করতে। কিন্তু কল্পনা থাকলে বুঝতে পারতে—যে, আচার না মেনেও ভক্তিকে শ্রদ্ধা করা সম্ভব, প্রাণহীন বিধিবিধানকে অবজ্ঞা ক'রেও মহত্ত্বের, পবিত্রতার পূজারী হওয়া যায়। কিন্তু যাক্—কী হবে এসব ব'লে? আলো জানে অন্ধকারের নিদান, কিন্তু অন্ধকার জানে না বোঝে না আলোকে—তাই আলো দেখলেই ওঠে রুখে, দেয় শাপমন্যি।

উদয়বাই কাঁদিতে কাঁদিতে প্রাসাদের দিকে প্রস্থান করিবার সঙ্গে সঙ্গে দৌবারিক আসিয়া অভিবাদন করিয়া ভোজরাজের হাতে একটি চিঠি দিল। মীরা বিমনা হইয়া মন্দিরের দিকে স্থিরনেত্রে চাহিয়া রহিলেন।

ভোজরাজ (পত্র পাঠান্তে, সোল্লাসে): মীরা! মীরা! কে এসেছেন জানো?—তানসেন—স্বয়ং তানসেন!—তোমার—দেখা চান।

মীরা (চমকিয়া): কী বলছ? তানসেন? বিখ্যাত—

ভোজরাজ: হ্যাঁ গো হ্যাঁ—মিঞা মল্লার, দীপক, বাহার, দরবারী কানাড়ার রচয়িতা—ভারতের কিন্নরমণি গুণিসম্রাট্ তানসেন—একেবারে সশরীরে!

মীরা (হাততালি দিয়া): কী চমৎকার—উঃ! (দৌবারিককে) যাও—যাও ছুটে—এক্ষনি আনো ডেকে।

দৌবারিক (অনিশ্চিত): এখানে মহারাণী? (ভোজরাজের দিকে চাহিয়া) মহারাণী—

ভোজরাজ (তীক্ষ্ণকণ্ঠে): মহারাণী নিজে হুকুম দিয়েছেন—তার পরেও মহারাণী! যা তাঁকে নিয়ে আয়—আর শোন্, সেই খাটানো পর্দাটা ও দুটো শতরঞ্চ। বুঝলি? যা দৌড়ে।

দৌবারিক (অভিবাদন করিয়া): জো হুকুম।

প্রস্থান

মীরা (ভোজরাজের কণ্ঠালিঙ্গন করিয়া): রাজ! রাজ! এ যে আশার অতীত। বিশ্বাস হচ্ছে না।

ভোজরাজ (সাদর ব্যঙ্গে): যার কাছে ধর্না দিতে নিরাকার হন একানন, তার কাছে মূর্তিমানের তো আসা উচিত দশানন হ'য়ে।

মীরা (রাগতঃ): যাও—তোমার সবতাতেই ঠাট্টা। সাক্ষাৎ তানসেন এসেছেন আমাদের এখানে—গাইবেন আমাদের সাম্‌নে—

ভোজরাজ: দ্বিবচন কেন দেবী?—যখন বেশ ভালো ক'রেই জানো—তিনি এসেছেন কার দর্শন পেতে।

মীরা (ভ্রূভঙ্গে—যদিও প্রসন্ন মুখে): এ-ধরনের কথা ঠাট্টা ক'রেও বলতে নেই। ফের যদি করো এমন ঠাট্টা—

ভোজরাজ: ঠাট্টা? শোনো তাহ'লে—(চিঠি পড়িলেন নটের ম'তন ভঙ্গি করিয়া)—"গরীব-নিবাজ্ মহারাণা! মেবারের মহারাণী ভারতবিখ্যাতা মীরাদেবীর কয়েকটি অপূর্ব ভজন আমি শুনেছি অন্যের মুখে। শুনে কী মনে হয়েছে নিবেদন করতে চাই তাঁর চরণে নিজে—যদি মেহেরবানি ক'রে তিনি দর্শন দিয়ে ধন্য করেন বান্দাকে। ভক্তিকে নিজের হৃদয়ে পাওয়া মুস্কিল—কিন্তু আরো মুস্কিল তাকে চারিয়ে দেওয়া হাজার হাজার ভক্তের হৃদয়ে। এ-হেন শক্তিমতী পুণ্যশীলাকে আদাব করতে গোলাম এসেছে সুদূর দিল্লি থেকে—আশা করি পূজারীর নজর প্রত্যাখ্যাত হবে না—"

মীরা (ব্রীড়াবক্তিম মুখে): হয়েছে হয়েছে।—না, অমন ক'রে বাঁকা হাসতে পাবে না। আমি পারব না কারুর পূজা নিতে।

ভোজরাজ (হাসিমুখে): বৃথা দেবী, বৃথা—যখন স্বয়ং মুনি বিধান দিয়েছেন তোমার বিপক্ষে: "স্বদেশে পূজ্যতে রাজা, শিল্পী সর্বত্র পূজ্যতে।"

মীরা: চুপ চুপ—ঠাট্টা ক'রেও এরকম মুনি ঋষির শ্লোককে তছনছ করতে নেই। ছিল "বিদ্বান্" তুমি করলে "শিল্পী"? উঃ—তুমি যে কী—!

ভোজরাজ: শুধু রসিক দেবী, শুধু নির্ভেজাল বোদ্ধা। কারণ বিদ্বানের চেয়ে ঢের বড় জ্ঞানী—আর শিল্পীর ম'ত জ্ঞানী কে? না মীরা—আমি ঠাট্টা করি নি—যেহেতু আমি বিশ্বাস করি—পুরাণ

সংহিতা প'ড়েও যে-ভাব না জাগে সে জেগে ওঠে তোমার একটিমাত্র ভজনে। এই যে—

ছুটি দৌবারিকের প্রবেশ, একজনের হাতে ছুটি শতরঞ্চ, অপরের হাতে কাঠের-কাঠামোয়-বসানো, পায়া-ওয়ালা পর্দা—যাকে মাটির উপর দাঁড় করানো যায়। পর্দাটি অতি সূক্ষ্ম মসলিনের—পর্দার ওধারে কেহ বসিলে এধার থেকে পরিষ্কার দেখা যায়।

ভোজরাজ: এইখানে রাখ্ বড় শতরঞ্চটা—হ্যাঁ এইখানে ছায়ায়—আর দেড়হাত দূরে ছোটটা—মাঝে পর্দাটা—না, একটু ঘুরিয়ে—দূর্—ওদিকে নয়, এদিকে—হ্যাঁ—এইবার ঠিক হয়েছে। এখন যা।

দৌবারিক-যুগলের প্রস্থান, সঙ্গে সঙ্গে উদ্যানপালকের সঙ্গে তানসেনের প্রবেশ: মীরা পর্দার আড়ালে সরিয়া আসনের উপরে দাঁড়াইলেন।

তানসেন (ভোজরাজকে কুর্নিশ করিয়া): তস্‌লীম, জনাবে-আলা!

ভোজরাজ: স্বাগতো ভবান্!

তানসেনের হাত ধরিয়া সাদরে শতরঞ্চের কাছে আনিতে

তানসেন (মীরার দিকে চাহিয়া আভূমিপ্রণত কুর্নিশ করিয়া): মহারাণী! আমার জীবনের একটি চিরস্মরণীয় দিন আজ—আপনার দর্শন পেলাম—আর কী!

মীরা (মাথা হেলাইয়া—আসনের দিকে দেখাইয়া): বিরাজিয়ে!

ভোজরাজ: গুণিসম্রাট্! আসন গ্রহণ করুন।

তানসেন (কুর্নিশ করিয়া): আল্লা হু আকবর! জগতের একমাত্র সম্রাট্ আল্লা—আর কেউ নয়।

ভোজরাজ (মীরার দিকে দৃষ্টিক্ষেপ করিয়া): মীরা! এরই নাম যোগ্যং যোগ্যেন যোজয়েৎ—ভক্তের সঙ্গে ভক্তিমতীর মিলন। উৎসব করো! উৎসব করো!

মীরা : এ আমার মহৎ সম্মান, গুণিরাজ !

তানসেন (পুনরায় কুর্নিশ করিয়া) : অল্‌হম্‌ দলিল্লা ! আমার— অভাবনীয় ভাগ্য, দেবী !

খানিকক্ষণ নিশ্চুপ

ভোজরাজ (নিস্তব্ধতা ভাঙিতে) : আপনি এখন আসছেন— ?

তানসেন : ভারতসম্রাট শাহানশাহ্‌ আকবরের দরবার থেকে, জনাব !

ভোজরাজ (আরক্তমুখে) : ক্ষমা করবেন, তানসেনজি ! ভারতে মেবার এখনো স্বাধীন—এবং চিরদিনই থাকবে স্বাধীন।

তানসেন (সকুণ্ঠে) : আমার কসুর হয়েছে, জনাব ! ভারতসম্রাট্‌ শব্দটা আমার উচ্চারণ না করাই উচিত ছিল—

মীরা (বাধা দিয়া স্নিগ্ধস্বরে) : আপনি একটুও অন্যায় করেন নি গুণিরাজ ! কারণ আপনার কাছে সম্রাট্‌ তো তিনিই।

ভোজরাজ (নিজের ভুল বুঝিয়া) : না, অপরাধ আমারি তানসেনজি !—আরো এইজন্যে যে আপনি আজ আমাদের মাননীয় অতিথি।

তানসেন : একথা বলবেন না জনাব ! সম্মান আমারি যে আমি আজ দর্শন পেলাম তাঁর যিনি ভক্তিরাজ্যের সম্রাজ্ঞী।

মীরা (হাসিয়া) : কিন্তু এইমাত্র বলছিলেন না—এ জগতের সম্রাট শুধু আল্লা—আর কেউ নয় ?

তানসেন (হাসিয়া) : সত্য। কিন্তু সঙ্গে সঙ্গে এ-ও কি সমান সত্য নয় যে, নিজের মহিমা সম্রাটের চোখে বেশি পড়ে যখন তার রোশনি ফ'লে ওঠে তাঁর ভক্তদের মনের আয়নায় ? তাছাড়া, মহারাণী,

মুখে যতই কেন না বলি—সব মানুষ সমান, মনে মনে সবাই জানে ও মানে যে বড়-যে সে বড় ব'লেই ছোট কোনোদিনই তার সঙ্গে কাঁধে কাঁধ মিলিয়ে চলতে পারে না। আপনি জন্ম থেকে অলোকসামান্যা—লোকে আপনাকে সাধারণের দলে টেনে আনবে কেমন ক'রে বলুন ?

ভোজরাজ (প্রসন্ন): গুণিরাজ! দেখছি আপনি সব্যসাচী—শুধু সঙ্গীতেই নন্—বাক্‌শিল্পেও অপরাজেয় !

তানসেন (পুনরায় কুর্নিশ করিয়া): জনাবে-আলা! আপনিও কম যান না—শুধু যুদ্ধেই অসিধর নন, কথায়ও মধুক্ষর। কেবল গোস্তাকি মাফ করবেন জনাব, যদি "শিল্প" কথাটা না ব্যবহার করতেন তবে আমার খুশির পেয়ালা উপছে পড়ত।

ভোজরাজ: কেন তানসেনজি ?

তানসেন: জনাব, শিল্প কথাটার মধ্যে কেমন যেন একটা সজাগ বাহাদুরির আমেজ আছে—যেন—কী বলব—যেন রূপসীর অত্যধিক প্রসাধন যাতে রূপের চেকনাই বাড়তে পারে কিন্তু মর্যাদা কমে।

মীরা: কিন্তু একথা আপনি কেন বলছেন তানসেনজি ? শিল্পের লক্ষ্য তো নয় প্রসাধন, তার লক্ষ্য নিখুঁৎ, নিটোল হওয়া। তাছাড়া সেই প্রসাধনই তো প্রসাধন যে অপূর্ণকে দেয় পূর্ণতা, প'ড়ে-পাওয়া জিনিসকে সুদে খাটিয়ে বাড়িয়ে তোলে।

তানসেন (চমকিয়া): মহারাণী! এদিক দিয়ে আমি ভাবি নি। কিন্তু আমার কী মনে হয়েছে বলব ? আমার মনে বারবারই এই প্রশ্ন জেগেছে—চলতি ভাষায় যাকে বলি শিল্প, সে কি সত্যিই নিখুঁৎ-হওয়ার প্রয়াস, না খুঁৎ-ঢাকবার কৌশল ? একটা দৃষ্টান্ত দেই। ছেলেবেলা থেকেই আমি গান শুনে আসছি। বড় বড় ওস্তাদ তো কতই শুনেছি ! কিন্তু কজন "শিল্পী"-র গানে আমার হৃদয়ের তার উঠেছে বেজে

বলব ?—হয়ত তিনটি কি চারটি। অথচ দেখেছি যাঁরা শুধু কণ্ঠের কস্‌রতে আসর জম্‌কান তাঁরাই হাতিয়ে নেন "শিল্পী"-র তক্‌মা। কিন্তু যে-শিল্প শুধু তাক্ লাগিয়ে দেয় হৃদয়কে মশগুল না ক'রে—কী করব তাকে নিয়ে ?

মীরা : আপনার অভিযোগের ভিত্তি নেই বলি না। কিন্তু এখানে—মাফ করবেন—একটু দৃষ্টিবিভ্রম হচ্ছে না কি ? শিল্পের মূল প্রেরণাটি কী ? না, তপস্যা—যার প্রসাদে স্ফুলিঙ্গ হ'য়ে ওঠে যজ্ঞশিখা, বীজ—বনস্পতি। আমার ভজনের লক্ষ্য—গোপালের পায়ের অর্ঘ-হওয়া। কিন্তু গোপাল যে আমার নিখুঁৎ—তাঁর পায়ে কী ক'রে দেব মলিন অর্ঘ, পোকায়-খাওয়া ফুল ? আমার মধ্যে যা সবচেয়ে ভালো তাকে যতটা পারি শুদ্ধ ক'রে, সুন্দর ক'রে তবে তো দেব তাঁকে ? যাকে সবচেয়ে ভালোবাসি তাকে কেমন ক'রে উপহার দেব কদন্ন, কদর্য ? তাই তপস্যা বলে—"তোমার মধ্যে আছে ভাবের সোনা কিন্তু তাকে যতটা পারো নিখাদ ক'রে তবে দেবে তাঁর চরণে।" এই পরমশুদ্ধির নামই তো শিল্পসাধনা। (হঠাৎ তানসেনের মুগ্ধ দৃষ্টিতে চমকিয়া) আমার প্রগল্‌ভতা ক্ষমা করবেন তানসেনজি! আপনার ম'তন মহাশিল্পীর সঙ্গে তর্ক—

তানসেন (করযোড়ে) : এমন কথা ব'লে আমাকে শরম দেবেন না দেবী!—আপনি তর্ক করেন নি, আমার জ্ঞান বাড়িয়ে দিলেন, দেখিয়ে দিয়ে—আসল খালিস শিল্পের লক্ষ্য ও স্বরূপ কী।

ভোজরাজ (হাসির ছলে কপালে করাঘাত করিয়া) : কিন্তু হায় রে, আমরা যে অবোধ, তানসেনজি! তাই জ্ঞানের চেয়ে গান ভালোবাসি।

মীরা (স্বস্তির নিশ্বাস ফেলিয়া) : সত্যি কথা। (তানসেনকে)

তবু ভাবুন তো এ কী বিড়ম্বনা—সাক্ষাৎ আপনি পদধূলি দিলেন আমাদের ঘরে—আর আমরা কি না আপনার গান শুনতে না চেয়ে কথা ক'য়ে সময় নষ্ট করছি? দয়া ক'রে গাইবেন না একটি গান?

তানসেন (করযোড়ে): এমন কথা ব'লে আমাকে কেন অপরাধী করা, দেবী? আপনি করবেন হুকুম—আর্জি নয়। বলুন কী গাইব?

মীরা: আপনার স্বরচিত কোনো রাগ। শুনেছি, আপনি যখন বাদলের আবাহন গান, আকাশ ঝর ঝর ক'রে কাঁদে। (ঊর্ধ্বে তাকাইয়া) দেখুন কোথাও মেঘের চিহ্নও নেই। একটু বর্ষালে কে না খুশি হবে?

তানসেন (মাথা হেলাইয়া): জো হুকুম, মহারাণী! আমি গাইব একটি বর্ষার গান—মল্লারের ঘর।

গান

আরো আরো আরো…বাদল বরসো আরো।
আরো আরো আরো…ঘোর ঘটা তুম ছারো॥

কৃষ্ণ নাম লে…ধূমধামসে…রঙ্গ শ্যাম লে…ঝুমঝামকে।
আরো আরো আরো…বাদল বরসো আরো॥

ভর দো নদিয়াঁ তাল কষারী…জল থল কর দো দুনিয়া সারী।
দেখেঁ শকতী আজ তুম্হারী—দামিন ধনুক লে আরো॥

মেঘপতী! মেহা বরসারো…পবন-হিন্দোলে আন ঝুলারো।
ধরতীকী অব প্যাস বুঝারো…গরজো বরসো আরো॥

আরো গায়েঁ রাগ মল্হার…সাজ বনে বরখাকে তার।
ঝমক উঠে সারা সংসার…ঐসী তান লগারো॥

গান শুনিতে শুনিতে মীরা চক্ষু মুদিত করিয়া একপাশ হইতে অপর পাশে দুলিতে লাগিলেন। ভোজরাজের মুখ উদ্ভাসিত হইয়া উঠিল। খানিক পরে মীরার সমাধি হইল: মুখে মৃদু হাসি, চক্ষে ধারা…তানসেন গাহিতে গাহিতে চাহিয়া দেখিতে লাগিলেন মুগ্ধনেত্রে।

ভোজরাজ (গান শেষ হইলে) : অ—পূর্ব !

তানসেন (মীরার দিকে দেখাইয়া) : শ্—শ্—শ্—

ভোজরাজ (সগর্বে হাসিয়া) : ভাববেন না তানসেনজি ! এখন যদি এখানে বজ্রপাতও হয়—ভাঙবে না ওঁর ভাবসমাধি।

উভয়ে চুপ করিয়া মীরার পানে চাহিয়া দেখিতে লাগিলেন মীরার মুখে আলোছায়ার খেলা: কখনো দিব্য হাসিতে উদ্ভাসিত, কখনো গম্ভীর, এই উজ্জ্বল, এই স্তিমিত…খানিক পরে মুদিত নেত্রে মীরা হাসিলেন অপরূপ অপার্থিব হাসি। তার পরে অপ্রত্যাশিত ভাবে তন্ময় হইয়া গান ধরিলেন

গান :

কার সে কথা আসে স্মরণে ফিরে ফিরে
আবার মেঘসম—ছেয়ে জীবনতীরে !—
যেদিন সুখরাতে নিঝুম ধারাপাতে
সুদূর হ'তে বঁধু বাজাত বাঁশি তার,
উঠিত গুনগুনি' পরে সে—আজো শুনি
কানে সে-গান তার মৃদুলঝঙ্কার,
গাহিত যবে বঁধু শিয়রে অতি ধীরে !

কত-যে কথা সখী স্মরণে আসে ফিরে
আবার মেঘসম—ছেয়ে জীবনতীরে !—

আবরি' ঘুমঘোরে আমার দুটি আঁখি
গোপন সঞ্চারে হৃদয়ে আসিত সে,
শূন্য মন্দির সম আঁধারে ঢাকি'
ছিল এ-প্রাণ—আশা-প্রদীপ জ্বালিত সে—
আমার ভুবন সে-হাসিতে উজলি' রে !

এই অবধি গাহিয়া মীরা হঠাৎ উঠিয়া ভাবাবেশে নৃত্য শুরু করিলেন। ভোজরাজ ও তানসেন উঠিয়া দাঁড়াইয়া শুনিতে লাগিলেন

গান :

কত-যে কথা সখী, স্মরণে আসে ফিরে
আবার মেঘসম—ছেয়ে জীবনতীরে !—
ফুরায়ে এলো বেলা···সে কই কাছে নেই,
বৃন্দাবন বুঝি বঁধুয়া গেছে ভুলে !
বলো না মধুবন, তুমি কি ব্রজ সেই
যেখানে সখী সাথে নাচিত দুলে দুলে
অতুল নীলমণি মুরলী মঞ্জীরে ?

কত-যে কথা সখী, স্মরণে আসে ফিরে
আবার মেঘসম—ছেয়ে জীবনতীরে !—
হে উদ্ধব, যদি প্রিয়ের সাথে ফের
তোমার দেখা হয়—চরণে নমি' তার
বোলো—সে পুছে যদি বারতা গোপীদের :
"ছলনা রাখি' আজ বলো না হে অপার !
সফল হবে প্রেম কেমনে হে অচিরে—
নিজে না এসে শুধু স্মরণে এলে ফিরে ?"

গানান্তে মীরা আসনে বসিয়া আবার ভাবসমাধিস্থ হইয়া পূর্ববৎ দুলিতে লাগিলেন —মুখে দিব্য স্মিত হাসি, কপোলে অশ্রুর প্রবাহ···

ভোজরাজ : এবার বুঝি সমাধি ভাঙার সময় হ'ল।

তানসেন (ঊর্ধ্ববাহু হইয়া সোল্লাসে) : অল্‌হম্‌ দলিল্লা !

মীরার সমাধিভঙ্গ হইল। পাশে স্বর্ণপাত্রে জল ছিল, পান করিয়া সাম্‌নের দিকে তাকাইলেন···তখনো ভাবের ঘোর চক্ষে জড়াইয়া···

তানসেন : মহারাণী !

মীরার কপোল ঈষৎ রক্তিম হইয়া উঠিল—তানসেনের চোখের দিকে চাহিয়াই চোখ নিচু করিলেন

তানসেন (ভোজরাজকে) : মহারাণা ! আজ কী স্বর্গীয় দৃশ্য দেখলাম ! কী স্বর্গীয় গান শুনলাম। কেবল—একটা সাধ হয়—আহা—যদি শাহানশাহ্‌ দেখতে পেতেন এ নাচ, শুনতেন এ গান !

ভোজরাজ (অপ্রীত কণ্ঠে) : তানসেনজি ! আপনার এ ধরনের সাধ আমাদের কাছে শ্রুতিমধুর নয়।

তানসেন (চমকিয়া) : কেন জনাব ?

ভোজরাজ (উষ্ণ স্বরে) : কেন—জিজ্ঞাসা করছেন ? ইতিহাস কি আপনার জানা নেই। রাজপুত রাণীকে দেখবে কি না—(আত্ম-সংবরণ করিয়া)—মুসলমান !

তানসেন : ক্ষমা করবেন জনাব ! কিন্তু এ-হেন ভজন রাজপুতেরো নয়, মুসলমানেরো নয়—এ হ'ল আল্লাকে ভোগ-দেওয়া প্রসাদ। প্রসাদ পাবার অনধিকারী শুধু সে যে তাকে অশ্রদ্ধা করে। আমি বলতে পারি —শাহানশাহ্‌ এ-প্রসাদ গ্রহণ করতেন পরম শ্রদ্ধায়—

ভোজরাজ (বাধা দিয়া) : ক্ষমা করবেন তানসেনজি ! এ-আলোচনা আমি আপনার সঙ্গে করতে অক্ষম।

মীরা (উৎকণ্ঠিত স্বরে) : কী—কী হয়েছে, রাজ ?

ভোজরাজ (উদ্দীপ্ত কণ্ঠে): শুনলে না স্বকর্ণে—ওঁর সাধ যায় শাহানশাহ্ তোমার নাচ দেখেন, গান শোনেন। বলো তো, এ ধরনের কথা শুনতেও কি রক্ত গরম হ'য়ে ওঠে না যে-কোনো রাজপুতের?

মীরা (শান্ত অথচ দৃঢ় স্বরে): রাজ! তুমি এ-ধরনের অসংযত ভাষা ব্যবহার ক'বে অতিথির অমর্যাদা করতে পারো এ আমি কোনোদিন ভাবতেও পারি নি। মনে রেখো, সে-রাজা অপরকে শাসন করবার অধিকারী নয় যে নিজেকে শাসন করতে জানে না। তাছাড়া তানসেনজি মিথ্যা বলেন নি—ভজন গান প্রসাদ, আর প্রসাদের অনধিকারী শুধু সে-ই যে শ্রদ্ধাভবে তার জন্যে হাত পাততে শেখেনি। যে শিখেছে, সে প্রসাদ দাবি করতে পারে তার শ্রদ্ধার সহজ অধিকারে: এখানে কে হিন্দু, কে মুসলমান এ-বিচার অবান্তর।

ভোজরাজ (সব্যঙ্গে): তোমার এ-ঔদার্য যুক্তিসঙ্গত হ'তে পারে কিন্তু শাস্ত্রসম্মত কি না সন্দেহ। তোমার গোপালের নানা গুণগানই শোনা যায় লোকমুখে—কিন্তু তাঁর মন্দিরে যে-কেউ ঢুকে তাঁর প্রসাদের জন্যে হাত পাতলে যে তিনি খুশিতে ভরপুর হ'য়ে ওঠেন—কেউ বলেনি এ-পর্যন্ত।

মীরা: তবে শোনো রাজ—যখন কথাই তুললে। আমাদের মন্দিরের জমাদার একদিন মন্দিরের দোরগোড়া থেকে মুগ্ধ হ'য়ে শুনছিল আমার ভজন। আমাদের আগেকার পূজারী তাকে মেরে তাড়িয়ে দেয়। আমি তখন গাইছিলাম—জানতাম না এসব। গানের শেষে গোপালের পায়ে ফুল দিলাম—ফুল প'ড়ে গেল। বার বার দিলাম অঞ্জলি—কিন্তু একবারও তিনি গ্রহণ করলেন না। সারারাত আমার ঘুম হ'ল না। শেষে রাতে আর পারলাম না। তুমি তখন ঘুমচ্ছিলে—আমি বিছানা ছেড়ে আস্তে আস্তে অন্ধকারেই মন্দিরে গিয়ে গোপালের পায়ে মাথা রেখে প্রার্থনা করতে লাগলাম। কিন্তু গোপাল অনড়, অচল, পাথর!

কেঁদে বললাম : "বলো গোপাল, কী হয়েছে ? কী অপরাধ করেছি আমি ?" তবু তিনি এলেন না। শেষে যখন অধীর হ'য়ে মাটিতে মাথা কোটা সুরু করলাম তখন গোপাল এলেন, কিন্তু আমাকে ছুঁলেন না— অন্তর্হিত হ'লেন শুধু এই কথাটি ব'লে : "যেখানে আমার ভক্তের অপমান সেখানে আমারও ঠাঁই নেই।" সঙ্গে সঙ্গে আমি দেখলাম ধ্যানে সেই জমাদারকে মার খেয়ে কাঁদতে কাঁদতে চ'লে যেতে। আমি তৎক্ষণাৎ লোক পাঠিয়ে তাকে ডেকে এনে আমার সামনে বসিয়ে গান ধরলাম। সে তো কেঁদেই সারা—সঙ্গে সঙ্গে স্পষ্ট দেখলাম গোপালের বিগ্রহের চোখ থেকে বিন্দু বিন্দু আনন্দাশ্রু গড়িয়ে পড়ল গাল বেয়ে। খানিক পরে হঠাৎ বিগ্রহ থেকে তিনি এলেন বেরিয়ে ও গাইলেন নাচতে নাচতে :

(সুর করিয়া)

রাখ্ তোর আপন মনে গোপাল :
যেথাই তীর্থ মন্দির যেথা বিরাজে নন্দলাল।

পূজি' শিলা-গ্রাম যদি মিলে হরি—পূজিব আমি পাহাড়।
তুলসী-অর্ঘে যদি মিলে—আমি করিব বন উজাড়।
মিলিলে গঙ্গাজলে—খান খান করিয়া ভাসাব অঙ্গ।
প্রীত যদি হরি আরতিতে—নিশিদিন লো বাজাব শঙ্খ।
নয় নয় সখী, সে প্রেমভিখারী—নাচে প্রেমে তালে তাল।
রাখ্ তোর আপন মনে গোপাল॥

অন্তরে ঝলে রবি, ধাই তবু বাহিরে কিরণ পিছু।
"হৃদিবাসী হরি"—বলি' হায় করি ইতি উতি শির নিচু।
ধরণীর কাছে চাই নীলাকাশ—মিলে শুধু ম্লান ধূলি।
বিমুখ বঁধুর সাধি প্রীতি—অবগুণ্ঠন নাহি খুলি'!
প্রেম বিনা তারে কে ধরিবে—বুনি' বাঁধনের মায়াজাল ?
রাখ্ তোর আপন মনে গোপাল॥

তানসেন : (সাশ্রুনেত্রে) : খোদা আপনাকে আশীর্বাদ করছেন মহারাণী ! আমি যখন বলব একথা শাহানশাহ্‌কে—তিনি কী বলবেন আমি জানি : "শুভানাল্লা ! এরি তো নাম ধর্ম—যা মানুষকে দেখিয়ে দেয় চোখে আঙুল দিয়ে যে সবার মধ্যেই তিনি।" কাজেই কে কাকে অবজ্ঞা করবে বলুন ?

ভোজরাজ (করযোড়ে) : তানসেনজি, আপনি মহৎ, মহাপ্রাণ। আপনার কাছে অপবাধ করেছি, ক্ষমা চাইছি।

তানসেন (তাঁর দুই হাত নিজের হাতের মধ্যে সাদরে টানিয়া) : গলতি হয়েছে আগে আমারি, জনাব ! আমার এটুকু কল্পনা থাকা উচিত ছিল—কিন্তু এ-শুভলগ্নে থাকুক এ মিথ্যা আলোচনা। কারণ ভুলবোঝার আঁধি যখন ওড়ে তখন চোখে ভালো দেখতে পাওয়া যায় না বটে, কিন্তু সে-আঁধি কেটে যেতে না যেতে দেখা যায় যে রোশনিই চিরন্তন সত্য—মেঘ ক্ষণিকের। আর একথা সব আগে জানে সে-ই যে পেয়েছে আল্লার এনায়েৎ। তার দৃষ্টি ঢাকবে এমন সাধ্য কোন্ বাদলের ?

ভোজরাজ : আমার মন থেকে বোঝা নেমে গেল। আপনি উদার —সহিষ্ণু—ধন্য আপনি !

তানসেন (হাসিয়া) : আপনার কীর্তি তার চেয়েও বড়—ভুল ক'রে স্বীকার করতে পারা। আপনার জন্মে রাজকুল গৌরবান্বিত।

ভোজরাজ (হাসিয়া) : মোগল দরবারের শ্রেষ্ঠ দরবারীর সঙ্গে কথায় কে পারবে ? (আকাশের দিকে চাহিয়া) বেলা হ'ল—আপনি এবার বিশ্রাম করুন—সন্ধ্যাবেলা (সামনের দিকে তাকাইয়া) এই—কোই হ্যায় ?

দৌবারিকের ছুটিয়া প্রবেশ

ভোজরাজ : ওস্তাদজিকে আমার মোতিমহলে নিয়ে যাও—

দেওয়ানজিকে বলবে নিজে এঁর দেখাশোনা করতে—আর—শোনো: তাঁকে বলবে সব সভাসদদের খবর দিতে: ওস্তাদজি আজ সন্ধ্যায় আমার বড় দরবার গৃহে গান করবেন—চারদিকে চিক টাঙিয়ে—

তানসেন (কুণ্ঠিত সুরে বাধা দিয়া): জনাব, আপনার সমাদর আপনারি যোগ্য—কেবল আমাকে মাফ করতেই হবে—আমি আপনার দরবারে গান গাইতে পারব না।

ভোজরাজ (ক্ষুণ্ণস্বরে): তাহ'লে দেখছি আমার অপরাধকে ক্ষমা করেন নি পুরোপুরি?

তানসেন (করযোড়ে): ছি ছি! এমন কথা ব'লে আমাকে অপরাধী করবেন না। ও তো একটা মিথ্যে ভুলবোঝার আঁধি এসেছিল। একটি গজলে আছে:

(সুর করিয়া)

প্রেমের যেথায় বসতি সেথা কি মায়ামেঘ পায় ঠাঁই?
হানাহানি হয় প্রেমে—শুধু আরো জানাজানি হ'তে তাই।

মীরা: একথা সত্য তানসেনজি। তবু মায়ামেঘও তো কিছু এক মুহূর্তে কাটে না। ক্ষত থেকে রক্তপড়া বন্ধ হ'লেও তো ব্যথা যায় না তখনি তখনি।

তানসেন: যায়—যদি সত্যি জানতে চাই কেন ব্যথা এসেছিল—কোন্ দুর্বলতার দরুন। মহারাণী! শুনে থাকবেন হয়ত—হিন্দুর ঘরেই আমার জন্ম—মুসলমান হই আমি পরে। কাজেই মুসলমানদের সম্বন্ধে সাধারণ হিন্দুর মনোভাব আমার কাছে অজানা নেই। কিন্তু আমার উদার বন্ধু শাহানশাহ্ আকবরের দীক্ষায় আমার চোখ খুলে গেছে: আমি দেখতে পেয়েছি—আচার মানুষকে কী ভাবে অন্ধ করে। (ভোজরাজকে) মহারাণা! আমার বন্ধু মহামতি। তাঁর কাছে এই

পাঠই পেয়েছি আমরা যে, অপরের ধর্মকে যে-মুসলমান নিজের ধর্মের চেয়ে কম শ্রদ্ধা করে সে মুসলমান-নামের যোগ্য নয়।

মীরা (আর্দ্রকণ্ঠে) : গোপাল আপনাদের দুজনকেই আশীর্বাদ করেছেন তানসেনজি—কেন না আপনারাই যথার্থ মুসলমান। (একটু পরে) কিন্তু তবে গাইবেন না কেন দরবারে ?

তানসেন (নতশিরে) : কারণ···মহারাণী···আপনি থাকবেন সেখানে।

মীরা (সবিস্ময়ে) : আমি থাকব ?—আমি থাকব তো বটেই। (তানসেনের উত্তর না পাইয়া) আপনার কথায় ধাঁধা লাগছে সত্যিই।

তানসেন (ম্লান হাসিয়া) : মহারাণী! আমার একটি মস্ত দোষ আছে—আমি অত্যন্ত অভিমানী। আপনার সামনে আমার গান জমবে না। তাই আপনার সামনে গাইতে আমি পারব না।

মীরা (আরো বিস্মিত) : কী বলছেন আপনি তানসেনজি ? আপনি · ভারতের সর্বশ্রেষ্ঠ গায়ক ও সুরকার···আ—আপনি পারবেন না আ—আমার সামনে গাইতে ? কেন ?

তানসেন (একদৃষ্টে তাঁহার দিকে তাকাইয়া) : কারণ···মহারাণী ···যে গানের সাধনা করেছে ভগবানের প্রসাদ পেতে তার সামনে গাইতে পারে না—যারা গায় মানুষের চিত্তরঞ্জন করতে।

তানসেন আভূমি-প্রণত কুর্নিশ করিলেন।

দ্বিতীয় দৃশ্য

আরো দুই বৎসর পরে। ভোজরাজের ইতিমধ্যে দেহান্ত হইয়াছে। এখন বিক্রম মহারাণা—ভোজরাজের মৃত্যুর পরে, মাস দুই আগে, তাঁহার রাজ্যাভিষেক হইয়াছে। কাল—সকাল। স্থান—সেই মন্দির-সংলগ্ন উদ্যান। যবনিকা উঠিলে দেখা যাইবে চিন্তান্বিত-মুখে বিক্রম বাগানে পাদচারণ করিতেছেন। আজ জন্মাষ্টমী, বহু দর্শনার্থী যোগী সাধু প্রভৃতি মন্দিরে পূজা দিতে প্রবেশ করিতেছেন ও পরে নিষ্ক্রান্ত হইতেছেন। বিক্রম চাহিয়া চাহিয়া ভ্রূকুটি করিয়া দেখিতেছেন যাত্রীদলকে। থাকিযা থাকিযা তাঁহার কানে ভাসিয়া আসিতেছে মীরার গানের রেশ—মন্দিরে মীরা গাহিতেছেন থামিয়া থামিয়া। কখনো বা শুনা যায় পুরোহিতের স্তব :

জয়তু জয়তু দেবো দেবকীনন্দনোঽয়ং
জয়তু জয়তু কৃষ্ণো বৃষ্ণিবংশপ্রদীপঃ।
জয়তু জয়তু মেঘশ্যামলঃ কোমলাঙ্গো
জয়তু জয়তু পৃথ্বীভারনাশো মুকুন্দঃ॥

বিক্রম অপ্রসন্নমুখে এই সবের সাক্ষী হইয়া উদ্যান পরিক্রমণ করিতেছেন। একবার মুখ তুলিয়া মন্দিরের দিকে তাকাইতেই তাঁহার চোখে পড়িল দুটি শ্মশ্রুল, বলিষ্ঠকায় পুরোহিতকে। তাহারা মন্দিরের দ্বারে আসিয়া পৌঁছিতেই মীরা গান ধরিলেন। তাহারা চৌকাঠের বাহিরে দাঁড়াইয়া স্থির হইয়া শুনিতে লাগিল—বিক্রমও মন্ত্রমুগ্ধবৎ শুনিতে লাগিলেন মীরার ভাবতন্ময় গান :

আমি প্রিয়ের জন্মদিনে নাচিব উছলি'—মন-
মোহনের আঁখিতলে নাচিব।
প্রেমের নূপুরতালে দিবে তাল জনে জনে,
নাথের জন্মদিনে নাচিব,
মন- মোহনের আঁখিতলে নাচিব।

আমি বঁধুর মধুনামের যাচিকা হব লো আজ,
পথে পথে শুধু তারে যাচিব।
অবগুণ্ঠন নয় নয় আর—হ'য়ে প্রেম-
পুজারিণী আনন্দে নাচিব,
মন- মোহনের আঁখিতলে নাচিব।

আমি বরি' চরণের ধুলি তার—হরিরঙ্গের
উল্লাসে আজ সখী, মাতিব।
জনম জনম যত বহিনু লো বন্ধন
সব টুটি' প্রিয়-সাথে নাচিব,
মন- মোহনের প্রেমদোলে নাচিব।

গান শেষ হইলে বিক্রম একটি দীর্ঘনিশ্বাস ফেলিয়া চিন্তিতমুখে চাহিয়া রহিলেন মন্দিরের পানে। সেই দুটি শ্মশ্রুল পুরোহিত চিত্রার্পিতবৎ তখনো দাঁড়াইয়া মন্দিরের দ্বারপ্রান্তে। বিক্রম মন্থর বিভঙ্গে সিঁড়ি দিয়া নামিয়া ফোয়ারার কাছে আসিয়া দাঁড়াইয়া রহিলেন মেঘলা মুখে।

বিক্রম (সহসা মাথা নাড়িয়া অর্ধস্বগত): না—আমি পারব না—পারব না কিছুতেই—

পিছনে পায়ের শব্দে চমকিয়া চাহিতেই দেখেন উদয়বাই

উদয়বাই (গম্ভীর): পারতেই হবে—আর তুমি জানো সেটা খুব ভালো ক'রেই।

বিক্রম (ভ্রূকুঞ্চন করিয়া): আচ্ছা উদা! কেন এমন করছ তুমি বলবে? ও আছে ওর মন্দির পুরুত পুজা অর্চনা নিয়ে—থাক্ না।

উদয়বাই (তিরস্কারের সুরে): "থাক্ না"—মানে? ও কি আছে একটা তাঁবুতে—না মেবারের রাজপরিবারে—যে-পরিবারের মাথা এখন তুমি—মনে রেখো: কি না—দায়িক।

বিক্রম (অপ্রসন্ন): দায়িক? কিসের?

উদয়বাই: কিসের নয়—তাই বলো? নৌকোর হাল ধরেছ যখন—ছাড়লে চলবে কেন? অবশ্য ভরাডুবি হোক এ যদি না চাও।

বিক্রম: ভরাডুবি? তুমি কেন যে মিথ্যে মিথ্যে এই সব অলুক্ষুণে কথা—

উদয়বাই: অলুক্ষুণে কথা? চোখ দুটো কি মুখ সাজানো? দেখতে পাও না কী ঘটছে তোমার সামনে—দিনের পর দিন? যে-রাজ্যের মহারাণার দেহ চিতায় দিতে না দিতে মহারাণী সব ভুলে মন্দিরে ভোজ দেয় সর্বসাধারণকে—উৎসব করে যাকে তাকে নিয়ে—নাচ গান করে যার তার সামনে—প্রসাদ বিতরণ করে সার সার কাঙালকে—

বিক্রম: এমন শক্ত শক্ত কথা কেন উচ্চারণ করো উদা? কীই বা এমন করেছে ও? ব্রত পূজা উপবাস এই নিয়েই তো আছে? পাঁচজনে যদি আসে মন্দিরে ওর ভজন শুনতে—

উদয়বাই: বিক্রম! ফের ঐ সুর? যদি নিজের মঙ্গল চাও তবে জেগে ঘুমিও না—মিথ্যে ভাববিলাসের দ-য়ে পোড়ো না। ডুববে।

বিক্রম: ডুবব? এ-ধরনের সাংঘাতিক বথা বোলো না উদা!

উদয়বাই (বিক্রমের স্কন্ধে হাত রাখিয়া স্নেহভরে): বিক্রম! আমি কেন বলি এমন অপ্রিয় কথা বুঝতে পারো না কি সত্যিই? তোমাকে আমি একরকম হাতে ক'রে মানুষ করেছি বললেই হয়। তাই জানি কোথায় তোমার দুর্বলতা—কোথায় তোমার মহত্ত্ব।

বিক্রম (আর্দ্রকণ্ঠে): জানি উদা! অকৃতজ্ঞ নই আমি। সে-বার অসুখে যদি তুমি রাতের পর রাত আমার শুশ্রূষা না করতে তবে—

উদয়বাই (আত্মপ্রসন্ন): সে যেতে দাও—আমি তোমার কাছে

কৃতজ্ঞতার প্রতিদান চাই নি কোনোদিনো—তুমি জানো। আমি শুধু চাই তোমার মঙ্গল—আমাদের পরিবারের মঙ্গল—যাতে এক দুশ্চারিণীর দুরাচারে আমাদের মাথা হেঁট না হয়।

বিক্রম : তোমার উদ্দেশ্য খুবই ভালো উদা! কিন্তু এ-সংসারে কে কার মাথা হেঁট করায় বলতে পারো? তাছাড়া ও স্বভাবে ভক্তিমতী —ভজন না করলে থাকেই বা কী নিয়ে?

উদয়বাই (কঠিনস্বরে) : সাবধান বিক্রম! অজান্তে ফের প'ড়ো না সেই ভাববিলাসের মোহে! একটা নষ্ট মেয়েকে শিরোপা দেওয়া "ভক্তিমতী"? সাবাস্ জোয়ান! ভক্তিমতী আর অসতী একসঙ্গে বাস করতে পারে এমন কথা তুমিই শোনালে প্রথম!

বিক্রম (অস্বস্তির সুরে) : থেকে থেকে কেন এমন সব লম্বা লম্বা কথা বলো উদা? অবিশ্যি সাবধান হওয়া ভালো, মানি—কিন্তু তা ব'লে কি অবিচার করা উচিত কারুর প্রতি?

উদয়বাই (তীক্ষ্ণকণ্ঠে) : অবিচার? তোমার চোখ কি দেখে না? কান যা শোনে মন তার মানে বুঝতে পারে না? পাঁচজনে কী সব বলাবলি করছে পাও না খবর? না, বলতে চাও বিধবার রীতিনীতি তোমার অজানা? শ্মশানে ভোজরাজের হাড় জুড়োতে না জুড়োতে মীরা শুধু ঘোমটা ফেলে দিয়েই ক্ষান্ত হয় নি, হাতে পরে বালা, কপালে দেয় সিঁদুর, চুল বাঁধে তেমনি—আরো কত কী কীর্তি যে করে ভগবানই জানেন—(মন্দিরে ফের শাঁক বাজিয়া উঠিতে) ঐ দেখ না চোখ চেয়ে—সার সার চলেছেন কাঙালের দল? (জ্বালাময় সুরে) তা ভাত ছড়ালে কবে কাকের অভাব হয়! (সপদদাপে) হায় রে! যদি আমি রাজকন্যা না হ'য়ে জন্মাতাম রাজপুত্র হ'য়ে।

বিক্রম (পরিহাসচ্ছলে) : কন্যা হ'য়েই আমাদের সবাইকার চক্ষুস্থির—পুত্র হ'লে কি আর রক্ষা ছিল!

উদয়বাই (উষ্মার সুরে) : রাজার সাজে না প্রগল্‌ভতা! না বিক্রম, এ ঠাট্টার কথা নয়। এখনো সময় আছে—সাবধান হও।

বিক্রম (ক্ষুব্ধ সুরে) : কেবল বলবে : "সাবধান হও"। কিন্তু সাবধান হ'য়ে করব কী তাই বলো না।

উদয়বাই : যাও। তোমাকে ভালো কথা বলতে যাওয়া বৃথা।

প্রস্থানোদ্যতা

বিক্রম (উদয়বাইয়ের হাত ধরিয়া) রাগ কোরো না উদা! বিশেষ এ-সময়ে—যখন আমি চাই তোমার উপদেশ।

উদয়বাই : উপদেশ চাই—উপদেশ চাই!—কিন্তু উপদেশ দিলে শুনবার সুমতি হবে কবে? আমি তো আর তোমার হ'য়ে মন্ত্রীদের আদেশ করতে পারি না।

বিক্রম (ক্ষুণ্ণ সুরে) : সবই বুঝি উদা! কিন্তু···সত্যি কথা বলব?—আমি ··আমি···সেই কালীমূর্তির কথা ভাবলেই আমার মন কেমন যেন বিকল হ'য়ে যায়, কী করব?

উদয়বাই (সশ্লেষে) : এ না হ'লে আর মহারাণা! স্বপ্নে কে না দেখে ভয়ের কত কিছু? কিন্তু তাই ব'লে জেগেও কি লোকে স্বপ্নের কথা ভেবে তটস্থ হ'য়ে থাকে না কি?—বিশেষ ক'রে ডাইনিকে ভয় করে কিনা মেবারের কুলতিলক মহামহিম-মহিমার্ণব—

বিক্রম (সভয়ে) : আমাকে ঠাট্টা করতে চাও করো—কিন্তু ভক্তিমতীকে ডাইনি বলা ভালো না।

উদয়বাই : বাজে কথা বোলো না। কয়লাকে কয়লা বলব না তো বলব কি কাঁচা সোনা? ডাইনি নয় ও? নৈলে এত লোককে বশ করতে

পারে ?—তুকতাক জানে ও তোমাকে ব'লে দিলাম। আর তাই তো বলছি তোমাকে এত ক'রে যে এইবেলা, সময় থাকতে, একটা বিহিত করো অনাচারের।

বিক্রম (মরীয়া হইয়া) : কেবল বলবে "বিহিত করো, বিহিত করো"! কিন্তু কী করতে পারি আমি বলো তো ? বিধবা বৌদিকে পারি না তো আর ঘরছাড়া করতে, কি বিষ খাইয়ে মারতে ?

উদয়বাই (গম্ভীর স্বরে) : পারো না ? কেন শুনি ? রামচন্দ্র করেন নি সীতাকে নির্বাসিত ? মোগল সৈন্য হানা দিলে রাজপুত স্বামীরা তাদের স্ত্রীদের জহর খাওয়াননি স্বহস্তে ? আবার বলি বিক্রম—সময় থাকতে সাবধান হও—নৈলে—কী দশা হবে তোমার—ভগবানই জানেন!

বিক্রম (ভয় পাইয়া) : কিন্তু কী করব আমি এ কথার দেবে না কোনো জবাব—খালি খালি বলবে : "সাবধান, সাবধান"! তুমি বুদ্ধিমতী হ'লেও মেয়ে—তাই জানো না রাজাও যাকে তাকে ইচ্ছা করলেই নির্বাসিত করতে পারেন না। ধরো, যদি মন্ত্রীরা বলেন "রাণীকে নির্বাসিত করতে চাইছেন—কী অপরাধে ?" তখন বলব কি—উদা বলে : "তাঁকে না তাড়ালে যে কী দশা হবে আমাদের, ভগবানই জানেন" ?

উদয়বাই (ভাবিয়া) : আচ্ছা, রোসো। এর তাহ'লে আমিই বিহিত করব। ওর মুখোষ দেব খসিয়ে। ও যে অসতী চোখে আঙুল দিয়ে দেখিয়ে দেব। কিন্তু (চাপা গম্ভীর সুরে) তুমি আমার কাছে প্রতিজ্ঞা করো—প্রমাণ পেলে দেবে সাজা ?

বিক্রম (স-দাপটে) : প্রমাণ পেলে ? কী ভাবো তুমি আমাকে উদা ? রাজবাড়িতে অসতীকে পুষব আমি তার অসতীত্বের প্রমাণ পাওয়ার পরেও ?

উদয়বাই : বেশ। আর শোনো এবার আমার প্রতিজ্ঞা : আমি যদি ওকে হাতে-নাতে না ধরি তবে আমি মেবারের রাজকন্যাই নই।

বিক্রম (উৎফুল্ল) : না, বলো : রাজার বাগ্বাদিনী মন্ত্রণাদাত্রীই নই। সত্যি, জানো আমার সময়ে সময়ে মনে হয় শঙ্কর রাওকে ছাড়িয়ে দিয়ে তোমাকেই বাহাল করি মন্ত্রীর পদে।

উদয়বাই (সস্নেহ কণ্ঠে) : তোমার মনটি যেমন উদার তেমনি নরম বিক্রম! তাই তো তোমাকে সবাই মিলে ঠকাতেই আছে। কিন্তু আমি চাই—তুমি হবে সব আগে বীর, কর্তব্যপরায়ণ। দয়া মায়া ভালো, কিন্তু রাজার সবার আগে পালনীয়—কর্তব্য।

উভয়েই চমকিয়া উঠিলেন মন্দিরে ঘন ঘন শাঁক ঘণ্টার শব্দে। তার পরে শোনা গেল মীরার কণ্ঠে ভাগবত-স্তব :

কৃষ্ণায় বাসুদেবায় দেবকীনন্দনায় চ।
নন্দগোপকুমারায় গোবিন্দায় নমো নমঃ॥
নমঃ পঙ্কজনাভায় নমঃ পঙ্কজমালিনে।
নমঃ পঙ্কজনেত্রায় নমস্তে পঙ্কজাঙ্ঘ্রয়ে॥

উদয়বাই : ঐ দেখ, চলেছে ভগবানের নামে এই ভণ্ডামি—ব্রতের নামে অভিনয়!—আর বিধবা হবার সঙ্গে সঙ্গে—ঐ দেখ না—মুখে ঘোমটার চিহ্নও নেই—হাসিখুশিতে ভরপূর! কী বলো তুমি বিক্রম! এর পরেও ওকে তুমি বলো কিনা "ভক্তিমতী"? জানো, সেদিন ও আমাকে কী বলল?—আমি ওকে নরম সুরে ভালো কথাই বলেছিলাম—সবার সামনে না বেরুতে—রাজরাণী তার উপর বিধবা—দৃষ্টিকটু দেখায়। ও বললে উচ্চাঙ্গের হাসি হেসে : গোপাল যার সর্বস্ব তার সাজে না লোকলাজ—যে তাঁর সাথী সে সবারই সাথী। (উত্তপ্ত স্বরে) : বটেই

তো—একেবারে অক্ষরে অক্ষরে—দেখ না চেয়ে সার সার চলেছে ভক্তের নামে সব ভেড়ার পাল—দেখবেন সর্বসঙ্গিনীর বাইজিপনা—ম'রে যাই! (বিক্রমের বাহু স্পর্শ করিয়া) আহা রে! ঐ দেখ দেখ—অত বড় দাড়ি—তাও বুঝি ভিজে যায় চোখেব জলে!

বিক্রম (মন্দিরের পানে চাহিয়া) : হ্যাঁ দাড়ি ব'লে দাড়ি! বোধহয় ছেলেবেলা থেকেই গজানো। (সহসা) কিন্তু উদা! এত বড় দাড়ি হয় এমন তরুণ মুখের? ঐ দুজনকে—দেখছ?

উদয়বাই (তীক্ষ্ণ দৃষ্টিতে চাহিযা) : দেখছি বৈকি। (সহসা) বিক্রম—আমি বলছি ওরা বাইরের লোক। চলো তো দেখি—কে ওরা! আমার মন ভগবান্—বলছে : এরা দুশ্‌মন—চলো চলো—না না এক্ষনি—দেরি করলে সব পণ্ড হবে।

বিক্রমের হাত ধরিয়া টানিয়া উদযবাই মন্দিরের সোপান অতিক্রম করিয়া সামনের তোরণে পৌঁছিয়া চৌকাঠের ওপাশে প্রচ্ছন্ন হইয়া দাঁড়াইলেন। ততক্ষণে সেই শ্মশ্রুল পুরোহিত-যুগল মন্দিরে প্রবেশ করিযা কথোপকথন শুরু করিয়াছে। উদযবাই ও বিক্রম সাগ্রহে শুনিতে লাগিলেন। এই সমযে মন্দিরের পুরোহিত মদনকে মন্দিরের সিঁড়িতে উঠিতে দেখিয়া বিক্রম ইঙ্গিত করিলেন উৎসব-সমাপ্তিব বিজ্ঞপ্তি দিযা বাহিরের যাত্রীদের নিরস্ত করিয়া শাস্ত্রীর ম'ত সিঁড়িতে দাঁড়াইয়া থাকিতে। বিক্রম ও উদয়বাই মন্দিরের দুটি ঘুলঘুলি দিযা দেখিতে লাগিলেন। শুনিতে লাগিলেন প্রতি কথাটি :

মীরা (মন্দিরের মধ্যে) : প্রয়াগ থেকে? গঙ্গাযমুনাসঙ্গমের দেশ? ধন্য আপনি!

সম্রাট্ আকবর (শ্মশ্রুল হিন্দু পুরোহিতের ছদ্মবেশে) : মহারাণী! ধন্য হয় মানুষ তার কীর্তির গুণে, জন্মের বা জন্মস্থানের প্রসাদে তো নয়। আপনার নিজেরি একটি গানে আছে :

তাঁকে যে বেসেছে ভালো হৃদে তার
পেয়েছে সে সব বিত্তার পার
দেখেছে যে তাঁর—

তানসেন (সমছদ্মবেশী—পাদপূরণ করিতে) :

অলখ আনন
ধন্য সে ভবে—সফল সাধন।

মীরা (সকৌতূহলে) : আমার সম্বন্ধে এত কথা জানেন—কে আপনারা, সুজন ?

আকবর : প্রতি পাতা, ফুল, ঘাস জানে আকাশকে, জপ করে বাতাসের নাম, কিন্তু আকাশ বাতাস নির্লিপ্ত, কাউকে মনে রাখে না।

তানসেন : সত্যি কথা, মহারাণী ! যে দেয় সে ভুলে যায়, কিন্তু যে পায় সে পারে না ভুলতে। আপনারি একটি গানে আছে :

এমনি স্মরণে জাগালে পরাণ,
ভুলালে যা-কিছু ছিল স্মরণে।
কী পেয়েছি তার কী গাহিব গান ?
কী দিয়েছ হায় কহি কেমনে ?

মীরা : মনে হয় যেন আপনাকে কোথায় দেখেছি—যেন কোথায় শুনেছি এ-কণ্ঠস্বর—

তানসেন (বাধা দিয়া) : না, মহারাণী, আমি অতি দীন হীন—তাছাড়া এই এসেছি প্রথম রাজপুতানায়।

মীরা : হবে। তবু আপনার কথার মধ্যে মনে হয় কী একটা মিড় আছে—যে-মিড় সঙ্গীতের।

আকবর (দুষ্টামির ভঙ্গিতে) : আপনার সন্দেহ মিথ্যা নয় : আমারও মনে হয় ওর গানের গলা আছে।

তানসেন : না মহারাণী, বন্ধু আমার কবি, তাই সবার মধ্যেই গুণীর দেখা পান।

মীরা (আকবরকে) : আপনি কবি! আহা, শুনতে পাই না আপনার দুএকটা রচনা ? তবে একটা কথা—যদি ভগবানের সম্বন্ধে কবিতা হয় তাহ'লেই, নৈলে নয়।

আকবর : কেন মহারাণী ? কবিতার মধ্যে যে-রস—

মীরা (বাধা দিয়া) : জানি, কবি! কিন্তু স্বভাব-অনুসারেই তো রসবোধ গ'ড়ে ওঠে। তাছাড়া যার জীবন একান্ত ভাবে চলেছে ভগবানের দিকে—আমার মনে হয় না সে—অন্তত সাধনার অবস্থায়—ভাগবতী কথা ছাড়া আর কোনো কথায রস পেতে পারে।

তানসেন (সোৎসাহে) : কিন্তু বন্ধু আমার ভাগবতী কথার একজন সত্যিকার কথক, কেবল মনের কথা শোনান না সকলকে। তবে (আকবরের দিকে চক্ষু ঠারিয়া) কেউ কেউ টের পায—অন্তর্যামী না হ'য়েও।

আকবর : থামো:।

মীরা : না, শোনান একটি কবিতা অন্তত:।

আকবর : মাফ করবেন মহারাণী!—আপনার সামনে কোন্ মূঢ় আবৃত্তি করতে যাবে তার নিজের কবিতা ?

মীরা : এখানে একটু ভুল করলেন কবি! জানেন তো, গীতায় কী বলেছে—ভগবানকে যারা ভালোবাসে তারা পরস্পরের কাছে তাঁর কথাই বলতে চায়—বোধয়ন্তঃ পরস্পরম্। ভগবানের কীর্তনীরা পরস্পরের সহযোগী, প্রতিযোগী নয়।

তানসেন : এখানে আমি আপনার সঙ্গে একমত, মহারাণী! তাই আপনার অধিকার আছে ওঁর কবিতা শুনবার।

আকবর : কী করো তা—কৈলাস!—তাছাড়া আমার কবিতা শোনাবো কোত্থেকে?—আমার কি ছাই মনে আছে?

তানসেন : আমার আছে। (আকবরের হাত ছাড়াইয়া) শুনুন মহারাণী, বন্ধু আমার অদ্বৈতবাদী। একবার লিখেছিলেন কোনো পাহাড়ের চূড়ায় ব'সে একটি চতুষ্পদী :

যেখানে যা-কিছু শুভ্র বিরাজে—অমল তোমারি অমলতায় :
রবি শশী তারা চাঁদ নীহারিকা তোমারি অলখ আলোকে ভায়।
"আমার আমার" করি হায় আজো তাই তো আড়াল ঘুচে না নাথ!
"তোমার তোমার" জপিলে দেখিব তোমারে প্রতিটি ধূলিকণায়।

মীরা (শিশুর ম'তন আনন্দে আত্মহারা হইয়া হাততালি দিয়া) : কী চমৎকার! আপনার গুরু কিনি?

আকবর (ঊর্ধ্বে অঙ্গুলি নির্দেশ করিয়া) : আল্—আলোর যিনি অধীশ্বর।

মন্দিরের বাহিরে উদয়বাই বিক্রমের দিকে অর্থপূর্ণ দৃষ্টিক্ষেপ করিলেন

মীরা (দীর্ঘনিশ্বাস ফেলিয়া) : যেন তাঁর আলো আপনাকে পথ দেখায়! কারণ মানুষ জন্মায় আঁধারে—আলো চাই তার প্রতি পদে—অথচ আশ্চর্য, আলো এলে করে বিদ্রোহ!

আকবর (নম্র সুরে) : জানি, মহারাণী! কিন্তু এ তো হ'ল রোগের নিদান। চিকিৎসা কী?

মীরা : সে জানেন জ্ঞানবৈদ্যরা। আমি সামান্য সাধিকা মাত্র—আমি বলতে পারি শুধু গোপালের কথা।

আকবর : কী কথা? অবশ্য বলতে যদি বাধা না থাকে—

মীরা : না বাধার কথা নয়—তবে প্রত্যেকেরি পথ যে আলাদা। আমার পথ—গুরুবাদের—গোপাল বলে।

আকবর : গোপাল ? মানে (বিগ্রহকে দেখাইয়া) ইনি ? না (উর্ধ্বে দেখাইয়া) তিনি ?

মীরা হঠাৎ গান ধরিলেন :

দেখেছি সে-নিরালারে উচ্ছল আনন্দ-জয়রোলে।
দেখেছি তাঁহারে শিখর-মৌনে—জনতার কল্লোলে।
দেখেছি তাঁহারে সূর্য-শৌর্যে—চাঁদের শান্তি-মাঝে।
দেখেছি তারায় সে-নয়নমণি, সমুদ্রে নটরাজে।
দেখিনি তাঁহারে শুধু আজো হায় যন্ত্রণা-সংঘাতে :
নমস্কার হ'লে লুপ্ত—দেখিব সেথাও বিশ্বনাথে।

শেষের দুই চরণ গাহিতে গাহিতে মীরা অশ্রুপূর্ণ নয়নে আঁখর দিতে সুরু করিলেন :

কে না দেখেছে সুখে তাঁহারে ?
ভবে সুখ চায় যারা সুখ পায় তারা—সুখে শুধু দেখে তাঁরে।
মীরা দেখিবে যেদিন তাঁরে,
গাঢ় বেদনে নয়নধারে,
দুখ রবে না যেদিন দুখ—সেই দিন লভিবে হৃদে তাঁহারে,
সবে আলোয় শ্রীনাথে দেখে—নিশিপাতে কে দেখে তাঁরে আঁধারে।

আকবর (গানান্তে খানিকক্ষণ চুপ করিয়া থাকিয়া গাঢ়কণ্ঠে) : দেবী ! একটা কথা—যদি অনুমতি দেন—

মীরা : আপনি সাধক—তাই আমার ভাই। অনুমতি আবার কী ?

আকবর : আপনার গান শুনলে জানি না কী হয়—হৃদয়ের মধ্যে ঠিক্ কোন্ তার ওঠে বেজে ! কিন্তু তবু···আপনি কি সত্যি বলতে চান যে দুঃখ আর সুখ এক ? না, বলব—আলোই তিনি, অন্ধকার আসে আলোর অভাবে ?

মীরা (মৃদু হাসিয়া): জানি—আপনি কী বলতে চাইছেন। ভাবছেন—আমি বেদনাকে নিয়েও বিলাস করতে চাই—এই না?

আকবর: ঠিক্ তা নয়—তবে—

মীরা (ললিত সুরে): মনের ভাবটা ঐরকমই বটে?…শুনুন। আমি কিছুই জানি না—জানি শুধু দুটি জিনিস: গোপাল ও প্রেম। জন্মে জন্মে যা কিছু পাই সবই তাঁর দেওয়া—এইই হ'ল গোপালের কথা। কিন্তু যতদিন এ থাকে মুখের কথা ততদিন এ-ধরনের বাণীকে—কথার কথা ছাড়া কী বলব বলুন? তাই আমি চাই—অন্তরে একথাকে উপলব্ধি কবতে। জীবনের পথচলায় প্রতি-পদেই দেখি—দুদিকে যাওয়া যায়। কোন্ দিকে মোড় নেব? কে ব'লে দেবে—গোপাল ছাড়া? তিনি বলেন—যা কিছু আসে সবই তাঁর দান ব'লে মেনে নেওয়া হ'ল প্রথম পদ, তারপর চাই সে-দানকে দান ব'লে দেখতে পাওয়া—চাক্ষুষ করা। আমি গাই গান, ডাকি তাঁকে। কখনো তিনি সাড়া দেন—তখন জীবন আমার আলোয় হেসে ওঠে। কখনো তিনি কথা কন না—তখন চোখে অন্ধকার দেখি। গানে গাই—দিনে দিনে এই আলো-আঁধারী পথে বিশ্বাসকে প্রেমকে পাথেয় ক'রে চলার ইতিহাস। সত্যের বাণী প্রচার করা আমার কাজ নয়—আমি শুধু সেইটুকুই পারি—যা আমাকে দিয়ে তিনি পারান, বলি সেইটুকুই যা আমাকে দিয়ে তিনি বলান। তাই কখনো হয়ত বলি বড় গলা ক'রে:

দুঃখ আমায় চাইলে দিতে পাব না তো দুঃখ আমি:
তোমার তরে দুঃখ, শ্যামল, সুখ হবে-যে দিবসযামী!
দুঃখ দেবে তায় কেমনে—দুঃখে যে পায় সুখ অনামী?

কিন্তু তার পরেই দর্পহারী হাসেন, তখন বলি চোখের জলে:

(সুর করিয়া)

"দুঃখ সবই সইব আমি"—বলি যখন অহংকারে,
জানি কি নাথ, কতটুকু দুঃখ এ-প্রাণ বইতে পারে ?
আলো চোখের কত প্রিয়—জানি শুধু অন্ধকারে।

আকবর : গানের আছে এক আশ্চর্য শক্তি। নয়কে হয় করতে সে পারে। তাই হয়ত গানে দুঃখও বিচিত্র হ'য়ে ওঠে দুঃখের মধ্যে দিয়ে এক নাম-না-জানা সুখের স্বাদ জুগিয়ে। হয়ত এইই তিনি চান যাঁকে ডাকি আমরা ভগবান ব'লে। তাঁর কিছুই জানি না মহারাণী—বুঝি না তাঁর মতিগতি···কিন্তু তবু মন প্রশ্ন করে : এ জগতে আমাদের জন্ম কি শুধু দুঃখকে মেনে নিতে ? আপনি এইমাত্র বললেন দুটি মনোভাবের কথা : একটি হ'ল দুঃখে সুখ পাওয়া। আর একটি দুঃখে দুঃখ পাওয়া। দুটিই হয়ত সত্য—মানে, অনুভব করা যায় সত্য ব'লে—মনের কোনো বিশেষ অবস্থায়। কিন্তু তবু—খতিয়ে—দুঃখ আর সুখ কি সত্যিই এক বলব—না, দুঃখকে মন্দকে অসত্যকে এড়িয়ে সুখকে ভালোকে সত্যকে চাইব ? বেদনাকে স্বীকার করতে পারা হয়ত অসম্ভব নয়—কিন্তু অঙ্গীকার করতে হবে কেন ? আপনি যেন বলতে চাইছেন দুঃখ থাকে থাকুক না—তাকে বরণ করো, শান্তি পাবে। কিন্তু বিষ বিষ ব'লেই কি মানুষ তাকে পাশ কাটিয়ে চায় না অমৃতকে ?

মীরা (ম্লান হাসিয়া) : আপনি জ্ঞানী, বিচক্ষণ, কবি। আমি সামান্য সাধিকা মাত্র। কী জানি বলুন দর্শনের ? আমি শুধু জানি—ঐ যে বললাম, মাত্র দুটি জিনিস—গোপালকে ও প্রেমকে। কেবল··· যদি কিছু মনে না করেন, তবে একটা প্রশ্ন আপনাকে জিজ্ঞাসা করতে চাই।

আকবর : বলুন।

মীরা : আমার প্রশ্নটি খুবই সরল। আমি বলি না দুঃখের যা মানে সুখেরও তাই। কিন্তু বলুন তো, যদি আজ এ-জগৎ থেকে এই মুহূর্তে সব দুঃখকে দূর করা যেত—তাহ'লে তার কী চেহারা হ'ত? ভেবে দেখেছেন কি কখনো?

আকবর : আমি ঠিক বুঝতে পারছি না আপনি কী বলতে চাইছেন।

মীরা : তাহ'লে আমি নিজেই এ-প্রশ্নের উত্তর দেই। ধরুন, যদি আজ রাতারাতি এ-জগৎ থেকে দুঃখ হ'ত নির্বাসিত, নামঞ্জুর—তাহ'লে সেই সব-পেয়েছি-র দেশে হয়ত সবই থাকত, থাকত না কেবল দুটি জিনিস : মহত্ত্ব ও ত্যাগ। এ-রকম জগতে হেসে-খেলে কাটাতে পারতেন কি দিনের পর দিন?—যেখানে কোনো অতৃপ্তিরই ঠাঁই নেই সেখানে তৃপ্তি ব'লে কি কিছু থাকতে পারে?

খানিকক্ষণ নিশ্চুপ

আকবর (স্পৃষ্ট কণ্ঠে) : দেবী! আমি এসেছিলাম ভক্তিমতীর দর্শন পেতে। কিন্তু এসে দেখলাম…কী দেখলাম…জানি না। আপনি আমার প্রণাম নিন।

মীরা (সকুণ্ঠে) : আমাকে অকারণ বাড়াবেন না। আমি আর পাঁচজনের ম'তনই একজন যাত্রী। পথ চলি—হৃদয়ের আলোয়। দুঃখে কাঁদি, সুখে হাসি—কিন্তু চেষ্টা করি তাঁর মনের ম'তন হ'তে—যাঁকে আমি ভালোবেসেছি। তিনিই আমাকে দেখিয়ে দিয়েছেন যে, হৃদয়ে যে-আলো সেও তাঁরি আলো। সেই আলোয় আমি বহু বেদনার ও পরীক্ষার মুখোমুখি হ'য়ে দেখতে পেয়েছি শুধু একটি সত্যকে যার সত্যতা

সম্বন্ধে আমার মনে সংশয় নেই : যে, তাঁর দর্শন পাওয়াই জীবনের শেষ লক্ষ্য নয়।

তানসেন : শেষ লক্ষ্য তবে কী ?

মীরা : তাঁকে বরণ করা—মানে, তাঁর হওয়া। সুখ দুঃখ দুইই আমার কাছে অবান্তর হ'য়ে গেছে—যেদিন থেকে আমি দেখতে পেয়েছি এই সত্যের সত্যকে। আর সেদিন আমার কণ্ঠে তিনি দিয়েছিলেন এই গান :

(সুর করিষা)

আমার জনম-মরণ সাথী !
তোমায় মনে পড়ে দিবারাতি।
তব তরে আমি পথ চেয়ে—যথা চাতক বরষা স্বাতী।

জানি না তো ধ্যান, জানি না তো জ্ঞান, সাধনারি কী বা জানি ?
চরণকমল শুধু মানি তব—মুক্তি সেথায়ই মানি।
প্রেমের ঠাকুর ! নাথ প্রিয় ! আমি নিশা—তুমি উষাভাতি।

নাই হে আমার বন্ধু বৈরী সঙ্গী সহায় স্বামী !
যুগে যুগে হৃদে তোমারি নামের পেয়েছি পারানি আমি।
তুমি বিনা আছে কে মীরার ?—দুখে সুখে তোমারেই সাধি।

গাহিতে গাহিতে মীরার চক্ষে ধারা বহিল···তিনি সহসা বিগ্রহকে প্রদক্ষিণ করিয়া নৃত্য শুরু করিয়া দিলেন শেষ স্তবকে—আঁখর দিতে দিতে :

বঁধু, জানি না তো আর কারে,
তোমা বিনা তো জানি না কারে,
শুধু তোমারেই জানি, তোমারেই মানি প্রাণের অন্ধকারে।
তব আশাপথ শুধু চেয়ে থাকি বঁধু, হরষ-বেদন-পারে :

এই বিরহ-মিলন পারে,
এই বাদল-কিরণ-পারে,
এই জনম-মরণ-পারে ॥

আকবর (চকিতে উদ্‌গত অশ্রু মুছিয়া) : আমাকে ক্ষমা করবেন তর্ক করবার জন্যে। আপনাকে আমি ঠিক বুঝতে পারি নি।···তবে ভগবানের প্রতি এ-রকম ভালোবাসার সঙ্গে তো আমাদের পরিচয় নেই দেবী! আর অচেনাকে চিনতে সময় লাগে।

মীরা : ভালোবাসার কি এ-রকম ও-রকম আছে কবি? ভালোবাসার একই স্বরূপ।

আকবর : তথা অপরূপ। (একটু পরে) আমাদের যাবার সময় হ'ল। দেশে ফিরে এই কথাটিই বুঝবার চেষ্টা করব—যদি পারি।

মীরা (হাসিয়া) : অচেনাকে চিনতে সময় লাগে বলছেন—অথচ সময় দেবেন না এ কেমন কথা? এসেছেন আমাদের দেশে অতিথি হ'য়ে—দুদিন থাকলেনই বা?

তানসেন (আকবরের জবাব দিবার আগেই) : না মহারাণী! ইচ্ছা আছে, কিন্তু নিরুপায়। আমাদের আজই রওনা হ'তে হবে।

আকবর (অনিচ্ছাসত্ত্বেও সায় দিয়া) : হ্যাঁ মহারাণী! মানুষ মুখেই বলে সে স্বাধীন—কিন্তু পদে পদে উপলব্ধি করে ঠিক্ উল্টোটা—বিশেষ ক'রে যখন সে দেখে—তৃষ্ণার জল হাতের কাছে অথচ তৃষ্ণা মিটাবার উপায় নেই।

মীরা (আকবরের দিকে স্থিরদৃষ্টিতে তাকাইয়া) : আপনি আগে কবি না আগে দার্শনিক বুঝতে পারছি না।

আকবর : দুটোর একটাও নয় দেবী! আমাকে যদি কোনো উপাধি দিতেই চান তবে ডাকবেন "জিজ্ঞাসু" ব'লে।

তানসেন : না মহারাণী ! বন্ধুর আমার ঠিক উপাধি—মহামতি ।

আকবর : এবার বিদায় নেবার সময় হ'ল ! এবার···কেবল···

মীরা : কী ?

আকবর (সকুণ্ঠে) : একটা অনুরোধ আছে—যদি রাখেন···

মীরা (আশ্চর্য হইয়া) : অনুরোধ ?

তানসেন (আকবরের ইঙ্গিতে) : বন্ধু আমার চান আপনাকে একটি উপহার দিতে ।

মীরা : উপহার ?

আকবর : উপহার না—সামান্য স্মারক-চিহ্ন ।

তানসেনকে ইঙ্গিত করিতে

তানসেন (আংরাখা হইতে একটি মঞ্জুষা বাহির করিয়া) : বন্ধু আমার চান—এই—

আকবর (তাঁহার হাত হইতে মঞ্জুষাটি গ্রহণ করিয়া খুলিয়া) : এই সামান্য হারটি আপনার চরণে নিবেদন করতে ।

সূর্যের এক ফালি কিরণে হারটি ঝিকমিক করিয়া উঠিল

মীরা (সবিস্ময়ে) : এ কী ? এ যে বহুমূল্য—

আকবর : না দেবী ! তবে বহুমূল্য হবে—যদি আপনার ছোঁওয়া পায় ।

মীরার চরণে রাখিলেন

মীরা (চক্ষু মুদিয়া খানিকক্ষণ বিগ্রহের সামনে দাঁড়াইয়া) : আচ্ছা গোপাল—(হাসিয়া)—তাই হবে। (চোখ মেলিয়া আকবরের দিকে চাহিয়া নমস্কার করিয়া, নত হইয়া হীরকহারটি তুলিয়া লইয়া বিগ্রহের

কণ্ঠে পরাইয়া) আহা! দেখুন দেখুন—এ-হার কি আমাদের গলায় শোভা পায়? (করতালি দিয়া শিশুসরল আনন্দে) যেখানকার যা! কেমন গোপাল? জানেন—গোপালের আমার একটি মাত্র দুর্বলতা—সে সাজগোজ করতে বড়ই ভালোবাসে। বা গোপাল! বেশ সেজেছ, বেশ সেজেছ! কেবল কও তাদের আশীর্বাদ যাদের দৌলতে এমন জড়োয়া সাজে সাজতে পেলে।

তানসেন (মাথা হেলাইয়া) : আমার অভিনন্দন—মহারাণী!

আকবর (মাথা নত করিয়া) : আমারো। (মাথা তুলিয়া মীরার দিকে চাহিয়া) এবার—যদি অনুমতি করেন দেবী—!

মীরা : বিদায় কবি! গোপাল আপনাদের আশীর্বাদ করছেন।

আকবর ও তানসেন আভূমিপ্রণত অভিবাদন করিয়া মন্দির হইতে নির্গত হইবার মুহূর্তে—

বিক্রম (মদনকে, চাপাকণ্ঠে) : ওদের পিছু নাও—চুপ্।

উভয়ে সিঁড়ি দিয়া নামিয়া গেলেন—মদন পিছনে

উদয়বাই (বিক্রমের হাত ধরিয়া মন্দিরে ঢুকিয়া) : এবার?

মীরা (উচ্ছ্বসিত কণ্ঠে) : দেখ বিক্রম, দেখ, গোপালকে আমার কেমন দেখাচ্ছে!

উদয়বাই (বিগ্রহের কাছে গিয়া) : এ কী! এ যে হীরে!

বিক্রম (কাছে গিয়া হারটি ছুঁইয়া) : আর নিটোল—ঝক ঝক করছে! (মীরার দিকে ফিরিয়া কঠিন কণ্ঠে) বলো : কারা এসেছিল?

মীরা : কারা? দুজন পুরোহিত।

উদয়বাই : পুরোহিতে দেয় এমন উপহার? বলো ওদের নামধাম —এক্ষনি বলো।

মীরা : অমন করছ কেন? ওদেব একজনের নাম কৈলাস—আর একজনের নাম—মনে পড়ছে না।

উদয়বাই (সশ্লেষে) : অভিনয় আর কেন—মুখোষ যখন খ'সে পড়েছে?

মীরা (সবিস্ময়ে) : অভিনয়? সে কী?

বিক্রম : কে ওরা? (মীরার হাত বজ্রমুষ্টিতে ধরিয়া) বলো—বলতেই হবে।

মীরা নির্বাক বিস্ময়ে বিক্রমের মুখের দিকে চাহিয়া রহিলেন

উদয়বাই : হাত ছেড়ে দাও বিক্রম! কে এসে পড়বে। (বিক্রম হাত ছাড়িয়া দিতে) ওদের সঙ্গে কারবার কতদিনের?

মীরা : তুমি কি পাগল হ'য়ে গেলে দিদি? বললাম না—ওরা বিদেশী—এসেছিল জন্মাষ্টমীতে—

উদয়বাই : তোমার রূপ দেখতে ও নাচগান শুনতে? চমৎকার!

বিক্রম (গোপালের কণ্ঠ হইতে হারটি খুলিয়া পরীক্ষা করিয়া চিৎকার করিয়া) : এ-পালিশ মোগল জহুরির। ওদের ধরতেই হবে—উদয়, তুমি থাকো—ওদের গ্রেপ্তার করতেই হবে—

উত্তেজিত ভাবে নিক্রান্ত

উদয়বাই : দাঁড়াও বিক্রম—

বাহির হইতে বিক্রমের স্বর : আমার ঘোড়া—ঘোড়া আনো···

উদয়বাই (তারস্বরে) : একলা যেও না বিক্রম! (ফিরিয়া মীরাকে) অলক্ষ্মী! তোমাকে ধরেছি এবার হাতে-নাতে—এবার কুকুর দিয়ে খাওয়াব—দাঁড়াও—

বলিয়া বিক্রমের অনুসরণে ছুটিয়া নিষ্ক্রান্ত

মীরা খানিকক্ষণ স্তব্ধ হইয়া দাঁড়াইয়া রহিলেন। পরে বিগ্রহের পানে স্থিরনেত্রে চাহিয়া রহিলেন···তাঁহার দুই গণ্ড বাহিয়া ধীরে ধীরে দুই বিন্দু অশ্রু গড়াইয়া পড়িল

মীরা (বিগ্রহের পাদমূলে নতজানু হইয়া): গোপাল! এ সব কী? আমি যে কিছুই বুঝতে পারছি না!·· চোখের সাম্‌নে সব আলো নিভে আসছে! তোমার সামনে ক'রে গেল আমাকে কুৎসিত অপমান—নিরপরাধে···আর তুমি কথাটি কইলে না! (করযোড়ে) বলো গোপাল, বলো তুমি—কেন এমন হ'ল—কী খেলা খেলছ তুমি আমাকে নিয়ে? আমার বুকের মধ্যে—মাথার মধ্যে—কেমন করছে! মেবারের মহারাণী আমি? তোমার পূজারিণী? না কে? বলো আমাকে। কেন আমাকে সইতে হ'ল এ-মিথ্যা কলঙ্ক? আমি তো সজ্ঞানে কোনো মহাপাপই করি নি। তবে? কোথায় নিয়ে চলেছ তুমি আমাকে? বলবে না? (একটু চুপ করিয়া) দেখা দাও—কথা কও। কী গতি হবে আমার? আমি যে বড়ই একলা, গোপাল! তোমার শরণাগতা। তুমি পথ না দেখালে কে দেখাবে গোপাল?—(অশ্রুগাঢ়কণ্ঠে) কেন ঘটল এমন অঘটন? মাত্র একজন ছিল যে আমাকে বুঝত—চিনত—ভালোবাসত এ-বিদেশে। তাকেও তুমি নিলে কেড়ে। কেন? তোমার চরণে আনতে? কিন্তু এসেছি তো আমি তোমার চরণে আপনা থেকেই—আর আজ ব'লে নয়—সে কবে! তবে? কিসের পরীক্ষা এ? দেবে না দিশা এ-নির্দিশায়? তুমি বলেছিলে—তুমি চাও আমি সবার মাঝে তোমাকে দেখি। কিন্তু অসুন্দর, মিথ্যা অপবাদ, নিষ্ঠুরতা—এসবের মধ্যেও তোমাকে দেখব কেমন ক'রে? কালোর মধ্যে কেমন ক'রে পাব আলোর দেখা—যখন সে-দৃষ্টি আমাকে দাও নি তুমি? (ম্লান হাসিয়া) শুনেছি তুমি লীলাময়।

লীলাই বটে! অন্ধকে বলো চোখ চেয়ে চলতে। পাখিকে খাঁচায় পুরে নির্দেশ দাও আকাশকে চাইতে। কিন্তু খাঁচার মধ্যে থেকে কেমন ক'রে পাবে সে মুক্তি? দিনের পর দিন তুমি এসেছ আমার কাছে, করেছ গান, কয়েছ কথা, বলেছ—আমি চলেছি ঠিক পথেই। কিন্তু যেই এল কালো ঝড়—তুমি গেলে মিলিয়ে···মেঘে আকাশ ছেয়ে গেল ···একটি তারাও যায় না দেখা—চলব কোন্ দিকে? তুমি বলতে—যে তোমার শরণ চায় সে তোমার চরণ পায়। কিন্তু কোথায় তোমার চরণ আজ? অন্ধকারে চলতে হবে আমাকে—এইই কি তুমি চাও? তুমি বলতে—ভালো যে বাসে আলো সে পাবেই পায়। কিন্তু কোথায় আলো আজ? (অশ্রুরুদ্ধ কণ্ঠে) তবে কি তোমাকে আমি ভালোবাসিনি নাকি? ছিলাম এতদিন এ নিজের মনগড়া মোহের স্বর্গে? কিন্তু তবে কেন থাকতে দিলে আমাকে এই মিথ্যার মোহে? কেন বললে না—যাকে আমি আলো ব'লে বরণ ক'রে এসেছি সে আলো নয়—আলেয়া—মরীচিকা? (মাথা নাড়িয়া) না না না। তোমাকে ভালোবাসিনি—একথা সত্য নয় নয় নয়। চোখ ভুল দেখতে পারে, কান ভুল শুনতে পারে, কিন্তু হৃদয় নিয়ে যায় না মিথ্যার দিকে। আমি অনন্যা—শুধু তোমারি—তুমি কেমন ক'রে আমাকে পায়ে ঠেলবে? আমার দুর্গতি হবে কেমন ক'রে প্রভু? তাহ'লে তো তোমারি কলঙ্ক। এ আমার গর্ব—অভিমান? না না না। আমি সইব সইব সইব—ভেঙে পড়ব কিন্তু মাথা নোয়াব না আর কারুর কাছে। আমাকে ওরা যদি শূলেও চড়ায় তবু গাইব আমি তোমারি গান—কিন্তু অন্যায় না ক'রে মানব না তিরস্কারকে। কলঙ্ক? সে হবে আমার জয়তিলক! বিষ? সেই হবে আমার অমৃত—জানি আমি—জানি জানি জানি।

নিষ্কাশিত কৃপাণ হস্তে বিক্রমের উন্মত্তবৎ প্রবেশ, তাহার পিছনে
পিয়ালা হস্তে রাজপুরোহিত মদন ও উদয়বাই।

বিক্রম (ক্রোধকম্পিত স্বরে) : তুমি—তুমি—তুমি—তোমাকে আজ আমি হত্যা করব সকলের সামনে—বেরিয়ে এসো মন্দির থেকে।

মীরা (শান্ত স্বরে) : হত্যা ? কেন ? কী করেছি আমি ?

বিক্রম : কী করেছ ? জানো না ? কাদের এনেছিলে ডেকে ? · ·

মীরা : আমি কাউকেই ডাকি নি। ওরা এসেছিল নিজে থেকে জন্মাষ্টমীতে—মন্দিরে অর্ঘ দিতে।

বিক্রম : দুশ্চারিণী ! শিবে সংক্রান্তি, তবু মিথ্যা কথা ? (চিৎকার করিয়া মীরার মণিবন্ধ বজ্রমুষ্টিতে ধরিয়া) বেরিয়ে এসো—এই মুহূর্তে—আমি সকলের সামনে তোমার মুণ্ডপাত করব।

উদয়বাই : বিক্রম ! ছী ! এ-রকম করে না।

বিক্রম (মীরার হাত ছাড়িয়া, অনিশ্চিত স্বরে) : করে না ?

উদয়বাই : না। রাজার কর্তব্য নয় রাগ করা—আত্মহারা হওয়া।

বিক্রম (সানুযোগে) : কিন্তু রাগই যে পুরুষের লক্ষণ—

উদয়বাই (যেন শোনেন নাই এই ভঙ্গিতে—মদনকে) : বলো তুমি যা দেখেছ স্বচক্ষে, শুনেছ স্বকর্ণে।

মদন (কম্পিত কণ্ঠে) : আমি ওদের পিছু নিলাম। খানিক দূর গিয়েই—ওরা মোড় নিল। গাছতলায় দুটি চমৎকার কালো ঘোড়া ছিল, চ'ড়ে বসল। ওদের মধ্যে একজন বলল "শাহানশাহ্" ! তিনি এদিক ওদিক চেয়ে বললেন : "চুপ্—আমার মনে হয় ওরা টের পেয়েছে।" ব'লেই দুজনে ঘোড়া ছুটিয়ে চ'লে গেল।

উদয়বাই (মীরার চোখে চোখ রাখিয়া) : এবার ?

মীরা (বিহ্বল কণ্ঠে) : শাহানশাহ্ ? মানে—সম্রাট্ আকবর ?

বিক্রম (ক্রোধকম্পিত কণ্ঠে) : হ্যাঁ গো হ্যাঁ—আর মুসলমান—ছদ্মবেশে ! এসেছিল হিন্দুর মন্দিব অপবিত্র করতে—আমাদের বংশগৌরব ধ্বংস করতে। আর এ কলঙ্কের বোঝা আমাদের বইতে হ'ল শুধু এক অসতীর জন্যে।

মীরা : কী বলছ বিক্রম ? আমি—

বিক্রম : হ্যাঁ—অসতী, অসতী, অসতী—আর স্বামীর যাওয়ার সঙ্গে সঙ্গে। চলো—তোমাকে সবার সাম্‌নে কুকুব দিয়ে খাইযে তবে আমি আজ জলগ্রহণ—

উদয়বাই : আঃ, কী করো বিক্রম ! স-ব তুমি পণ্ড করবে—যদি এইরকম পাগ্‌লামি করো। মনে রেখো ও তোমার আমার চোখে যাই হোক বহুলোকেব চোখে সতী সাবিত্রী, পুণ্যবতী, ভক্তিমতী। তা ছাড়া ও যাই হোক—মেবারের রাণী। তাকে শাস্তি দিতে হবে—মানি, কিন্তু যথাবিধি।

বিক্রম : যথাবিধি ?

উদয়বাই : তুমি একটু চুপ করবে ?—আমি সব ব্যবস্থা করেছি। (মদনকে) দাও ওকে পিয়ালা।

বিক্রম : পিয়ালা ?

মদন : হ্যাঁ মহারাণা—বিষের।

বিক্রম (সোল্লাসে) : এইই তো চাই। বিষ খেয়ে মরবে—যন্ত্রণায় কুঁকড়ে—মুখে ফেনা উঠে—আর ওর গোপালের সাম্‌নে। দেখি ওর গোপাল কী করে !

উদয়বাই (জ্বালাময় কণ্ঠে) : হ্যাঁ—দেখাই যাক্ না কে বেশি শক্তিধর : গোপালের করুণা, না রাজার ক্রোধ।

বিক্রম : হ্যাঁ—আর—এবার (সদর্পে) দেখবে জগৎ !

মীরা (মাত্র একবার গোপালের দিকে তাকাইয়াই মদনকে) : দাও বিষ।

মদন (কাঁদিয়া) : আমি পারব না, মহারাণী!

উদয়বাই (ক্রুদ্ধ) : পারবে না ? কাপুরুষ! দাও আমাকে—(মদনের হাত হইতে পিয়ালা ছিনাইয়া লইয়া মীরাকে)—নাও।

মীরা (পিয়ালা হাতে করিয়া বিগ্রহের পানে) : গোপাল!

বলিয়াই একচুমুকে পিয়ালা নিঃশেষ করিলেন। মদন দুই হাতে মুখ ঢাকিল…এক…দুই…তিন…চার…পিয়ালা মাটিতে পড়িয়া চূর্ণবিচূর্ণ হইয়া গেল…মীরা ধীরে ধীরে দুলিতে লাগিলেন কিন্তু পড়িলেন না…সঙ্গে সঙ্গে সামনে বিগ্রহের শ্বেত আভা নীল হইয়া গেল—বেদী থর থর করিয়া কাঁপিয়া উঠিল…সঙ্গে সঙ্গে—

মদন (সোল্লাসে) : মহারাণী! মহারাণী! ধন্য! ধন্য! মা!

মীরার পদপ্রান্তে পড়িয়া গেলেন

উদয়বাই (ভয়বিহ্বল কণ্ঠে) : এ কী! (বিস্ফারিত চক্ষে) কী দেখছি! গলায় মুণ্ডমালা…হাতে খাঁড়া…উলঙ্গিনী…মা মা মা—রক্ষা করো, মেরো না—আর কখনো এমন—

বাক্‌রোধ হইল, দুই হাতে নিজের মাথা ধরিয়া চক্ষু মুদিয়া দুলিতে লাগিলেন

বিক্রম (ভয়বিহ্বল) : এ কী! আমি কি জেগে আছি ? না—নরকের স্বপ্ন এ ?… ও কে ? গোপাল! তার দেহে—প্রতি শিরায়—ও কী বইছে ?…কালো বিষ ?…আমি পাগল হ'য়ে যাচ্ছি না কি ? (প্রাণপণে চিৎকার করিয়া) কালোমূর্তি, লালচোখ ও কারা ছুটে আসছে শূল হাতে ? বাঁচাও—বাঁচাও—আমাকে মেরো না—

উদয়বাই (চিৎকার করিয়া) : ডাইনি! ডাইনি! পালাও বিক্রম—পালাও—যদি বাঁচতে চাও—

উর্ধ্বশ্বাসে নিষ্ক্রান্ত

বিক্রম : আমাকে ফেলে যেও না উদয়! আমি—আমি—

কাঁপিতে কাঁপিতে নিষ্ক্রান্ত

বিগ্রহনিবদ্ধদৃষ্টি মীরা পাষাণমূর্তির মতন দাঁড়াইয়া রহিলেন···মদন
ধীরে ধীরে উঠিয়া দাঁড়াইলেন

মদন (করযোড়ে, অশ্রুগাঢ়কণ্ঠে) : মা মা! দেবী!—কুলং পবিত্রং জননী কৃতার্থা—

মীরা (চমক ভাঙিতে) : কে?—ও—মদন!

মদন : না মা, পাপিষ্ঠ, নরাধম! ক্ষমা করো মা—আমি চিনতে পারি নি তোমাকে···আমি···আমি···

দুই হাতে মুখ লুকাইয়া ফুঁপাইয়া ফুঁপাইয়া কাঁদিতে লাগিলেন

মীরা (স্নেহভরে) : কেঁদো না বাবা! তোমার অপরাধ কী!

মদন (মুখ তুলিয়া) : অপরাধ মা? জিজ্ঞাসা করতে পারছ? আমি এনেছিলাম বিষ হাতে ক'রে—মুসলমান আমাদের মন্দির কলুষিত করেছে এই জ্বালায়। কিন্তু আমি কেমন ক'রে জানব মা—তুমি যেখানে সেখানে কলুষের ছায়াও পড়তে পারে না? কেমন ক'রে জানব—তুমি মূর্তিমতী দেবী—গোপালের আশ্রিতা?

মীরা (ম্লান কণ্ঠে) : না বাবা! আমি আর পাঁচজনের ম'তনই সাধারণ মানুষ। তাই তো···(অশ্রুবিহ্বল কণ্ঠে)·· দেবতাকে আসতে হ'ল রক্ষা করতে। দেখ দেখ চেয়ে—আমার বিষে কি না গোপাল আমার নীলবর্ণ হ'য়ে গেছেন—যিনি আমাকে দিয়েছেন অমৃত—তাঁকে প্রতিদান আমি দিলাম কি না বিষ!

বলিয়া একদৃষ্টে চাহিয়া রহিলেন বিগ্রহের পানে করযোড়ে…গণ্ড বাহিয়া অঝোরে অশ্রু গড়াইয়া পড়িতে লাগিল

মদন (কাঁদিয়া) : আমার নরকেও স্থান হবে না যে মা! কী করব—তুমি না দয়া করলে?

মীরা (ফিরিয়া তাঁহার স্কন্ধে হাত রাখিয়া) : অধীর হোয়ো না বাবা! শোনো। গোপাল আমাকে বলেছেন এমন পাপ নেই অনুতপ্ত হ'য়ে তাঁর পায়ে শরণ নিলে যার প্রায়শ্চিত্ত না হয়। আমরা অজ্ঞান অবোধ অন্ধ—আমরা তাঁর করুণাকে চিনব কেমন ক'রে? তেমন চোখ শুধু তিনিই দিতে পারেন যে সইতে পারে তাঁর জ্যোতি।

মদন (তাঁহার পদতলে পড়িয়া) : তবে রক্ষা পাব মা? রক্ষা করবেন তিনি সত্যি—এমন পাপিষ্ঠকে?

মীরা (নত হইয়া তাঁহার শির স্পর্শ করিয়া) : বাবা! তিনি কি বলেন নি—সবছেড়ে যে তাঁর শরণ চায় তাকে তিনি সমস্ত পাপ থেকে মুক্ত করেন? ওঠো। শোনো কথা : তাঁর নাম পতিতপাবন। যদি আমার ম'তন দুর্গতাকে বাঁচাতে তিনি আমার বিষ টেনে নিতে পারেন নিজের দেহে তবে তোমাকে কি দিতে পারেন লঘুপাপে গুরুদণ্ড—বিশেষ যখন তুমি অনুতপ্ত? ওঠো—অকারণ মন খারাপ কোরো না।

মদন (উঠিয়া, অশ্রুগাঢ় কণ্ঠে) : তবে বলো—ক্ষমা করেছ মা?

মীরা : আমি ক্ষমা করবার কে বাবা? ক্ষমা করবার, কি দণ্ড দেওয়ার অধিকার শুধু তাঁর। তাঁকে ডাকো—যদি অন্যায় কিছু ক'রে থাকো তাঁর কাছে অকপটে স্বীকার করো—দেখবে মনের সব গ্লানি যাবে কেটে। নির্মলকে যে ডাকে পাপ কি তার ছায়া মাড়াতে পারে? যাও বাবা—আমি একটু একলা থাকতে চাই।

মদন মীরার পদচুম্বন করিয়া কাঁদিতে কাঁদিতে নিষ্ক্রান্ত

নিঃসঙ্গ মীরা খানিকক্ষণ একদৃষ্টে বিগ্রহের পানে চাহিয়া রহিলেন…সহসা তাঁহার বিষণ্ণ মুখ উদ্ভাসিত হইয়া উঠিল…দেহ পুলকশিহরণে কাঁপিয়া উঠিল…তিনি উচ্ছ্বসিত কণ্ঠে গান ধরিলেন :

এল পরম লগন, মীরা প্রেমে-মগন,
গেয়ে কীর্তন বঁধুর পথে পথে চলে।
ছিল কাল মানিনী, হ'ল আজ যোগিনী,
"হায়, রাণী পাগলিনী"—সবাই বলে!

যাকে বাজে ব্যথা—জানে ব্যথার কথা,
পরের দুঃখে কোন্ দরদীর পরাণ গলে?
নিখিল দিক না দুখ, যায় যাক না সব সুখ,
মীরা গোপালে ধেয়ায় তার হৃদয়তলে।

বাঁধে বাঁধবে কে তায়? পিছু ডাকা কি যায়
উধাও সে চলেছে—মিলবে যে সিন্ধুজলে?
জহর রাণা দিল, সুধা ব'লে নিল,
গরল হ'ল মীরার প্রিয়ের প্রসাদ পলে।

এই সময়ে অকস্মাৎ বিগ্রহ হইতে কিশোর কৃষ্ণ বাহির হইয়া আসিয়া মীরার সামনে দাঁড়াইলেন

মীরা (উচ্ছ্বসিত কণ্ঠে) : গোপাল! …গোপাল!… গোপাল!…

কৃষ্ণ কোনো কথা না বলিয়া মীরার গানের সুরে সুর মিলাইয়া গান ধরিলেন :

সেধে মোহনের রঙ্গ চায় উদাসীর সঙ্গ,
আজ চিরন্তন প্রেমেই সে সমুচ্ছলে।
হয় দুঃখও সুখ—যার শ্যাম ভরে বুক,
তখন জীবন মরণ একই ছন্দে চলে।

মীরা তাঁহার হাত ধরিয়া তাঁহার নূপুরের তালে তালে তাঁহার সহিত নৃত্য সুরু করিলেন, উভয়ে একসঙ্গে গাহিতে লাগিলেন নাচিতে নাচিতে :

সেথে মোহনের রঙ্গ চায় উদাসীর সঙ্গ,
আজ চিরন্তন প্রেমেই সে সমুচ্ছলে।
হয় দুঃখও সুখ—যার শ্যাম ভরে বুক,
তখন জীবন মরণ একই ছন্দে চলে!

মীরা (গানের শেষে লুটাইয়া পড়িয়া গোপালের পা জড়াইয়া ধরিয়া): গোপাল!···গোপাল!···গোপাল!···

কৃষ্ণ (তাঁহাকে দুই বাহু ধরিয়া সস্নেহে উঠাইয়া): মীরা!·· মীরা! ···মীরা!···

মীরা (একদৃষ্টে তাঁহার দিকে চাহিয়া): এবার গোপাল?

কৃষ্ণ: এবার সব ছাড়বার পালা। তোমাকে হ'তে হবে সন্ন্যাসিনী —যেতে হবে বৃন্দাবনে—একা—পদব্রজে।

মীরা: বৃন্দাবনে? কে আছে সেখানে?

কৃষ্ণ: আমার ভক্ত—তোমার গুরু—সনাতন।

মীরা: এখনো গুরু?—তোমাকে পাবার পরেও?

কৃষ্ণ: কিন্তু আমাকে কি পেয়েছ—পুরোপুরি?

মীরা: পাই নি? এত দেখেও?

কৃষ্ণ: কী দেখেছ?

মীরা: আমাকে—তোমার মধ্যে: বিন্দুকে সিন্ধুর বুকে।

কৃষ্ণ: আরো একটু দেখা বাকি আছে।

মীরা: কী?

কৃষ্ণ: ইষ্টকে গুরুর মধ্যে—সিন্ধুকে বিন্দুর বুকে।

মীরা সাষ্টাঙ্গ প্রণাম করিলেন···কৃষ্ণ তাঁহাকে উঠাইয়া বাহুপাশে আবদ্ধ করিলেন।

যবনিকা

তৃতীয় অঙ্ক

মীরা আজ দুই বৎসর ধ'রে পরিব্রাজিকা : সাধুসন্ত সন্ন্যাসীর সঙ্গে পথেঘাটে বিচরণ ; ভিক্ষান্নে জীবনধারণ , মন্দিরে মন্দিরে ভজনগান ; নানা লোককে সরলভাবে বিশ্বাস ক'রে প্রবঞ্চিত হওয়া , অনাত্মীয়, নির্বান্ধব স্থলে অসুখে পড়া ; দুষ্টলোকের আক্রমণ···এইসবই আজ তাঁর উপজীব্য। কিন্তু শুধু এই বাইরের দুঃখই নয়—এই দুইবৎসর কৃষ্ণ তাঁকে একটিবারও দেখা দেন নি—এমন কি স্বপ্নেও না। পথশ্রান্ত, ছিন্নকন্থা, ধূলিধূসরিতা ভিখারিণী রাজকন্যা অবশেষে পদব্রজে বৃন্দাবনে উপনীত হইলেন—হাতে শুধু একটিমাত্র সম্বল—সেই বালগোপালের বিগ্রহ।

যবনিকা উঠিলে দেখা যাইবে মীরা বৃন্দাবনের প্রান্তসীমায় যমুনার ধারে একটি নিরালা মাঠে তরুচ্ছায়ায় নিদ্রিতা। প্রভাতসূর্যের রাঙা আলোয় তাঁহার শীর্ণ, ক্লান্ত মুখখানি অপরূপ দেখাইতেছে। কাছেই একটি স্নানের ঘাট—যদিও এত দূরে স্নানার্থী কমই আসে। মীরার মাথার উপরে পাতার আড়ালে একটি কোকিল ডাকিতেছে।

চারটি স্নানার্থিনীর কাঁকে কলসী লইয়া প্রফুল্লমনে প্রবেশ :
এক পাড়ার পড়োশিনী : সরলা, সরমা, সুশীলা, কমলা

সরলা (হাসিতে হাসিতে) : ছি ছি, তুই এমন অশ্লীল—সরমা !

সরমা। (মুখ বাঁকাইয়া) : আ—হা ! যেন অমৃতে জিভের অরুচি ! হেসে কুটি কুটি—অথচ আপত্তিও করা চাই অশ্লীল ব'লে।

সরলা : বা রে ! কাতুকুতু দিলে না হেসে কেউ পারে ? আমাদের যা-কিছু ভালো লাগে—তা-ই বুঝি ভালো ? শাস্ত্রে বলে নি —সস্তা আমোদপ্রমোদ করলে আখের নষ্ট ?

সরমা। বড় বড় কথা কপ্‌চাস্‌ নি সরলা ! গা জ্বালা করে। শাস্ত্র মেনে মেনে তো চোখ উল্টে গেল ! তার উপর আবার গুরুগম্ভীর বক্তৃতা ! এ কু-অভ্যাস ছাড়্‌—নৈলে তোর দশা হবে—কার ম'ত বলব ?

সবলা : বলবি না ? কুডাক ডাকতে তোর জুড়ি কে ?

সরমা (গম্ভীর হইয়া) : কুডাক নয়—আমি দেখেছি বড বড় বুলি যারাই আওড়ায় তাদেরই দুর্ভোগের অন্ত থাকে না। কেমন শুনবি ? এই ধর্ না কেন কালই সন্ধ্যাবেলা এসেছিল আমার কাছে এক ভিখিরি মেয়ে—কিন্তু মর্! ভিক্ষে চাইতে এসেছিস ধমক দিবি কেন ? সে গাইতে লাগল মরণের গান—যম আছেন চুলের মুঠি ধ'রে এই ভাব আর কি। আমি তাকে দিলাম ঘাড় ধ'রে বার ক'রে—বেরো! (সহসা মীরার শায়িতা মূর্তির 'পরে দৃষ্টি পড়িতে) ও মা! এ যে সেই মেয়েটাই!

সবলা (মীরার দিকে তাকাইয়া) : আ—হা! (সরমাকে) কোন্ প্রাণে তুই ওকে ভিক্ষে না দিয়ে খেদিয়ে দিলি সরমা! বোধহয় হৃদয়টা তোর পাথর দিয়ে গড়া।

সরমা (বিরক্ত) : ম'রে যাই!—যেন ভিখিরি এলেই তাকে দিতে হবে ঘরে চাল ডাল যা আছে সব উজাড় ক'রে!

সবলা : কিন্তু তোর কি চোখ নেই লো ? এ-মুখ কখনো ভিখিরির হয় ? এ কোনো বড় ঘরের মেয়ে, ব'লে দিলাম তোকে—লিখে রাখ্।

কমলা (মীরার দিকে এতক্ষণ চাহিয়া ছিল) : ওমা! তাই তো! দেখ্ দেখ্, ওর কোলে কী সুন্দর বালগোপালের বিগ্রহ! না সরমা, সরলা ঠিকই বলেছে : এ কোনো বড়মানুষের মেয়েই হবে।

সরমা (ব্যঙ্গ হাসিয়া) : তাহ'লে তো ব্যাপারটা দাঁড়ায় আরো সঙিন লো!

কমলা (ঈষৎ আশ্চর্য) : সঙিন ? কেন লো ?

সরমা : তাও বলতে হবে না কি ? কোনো রসের নাগরের জন্যে ঘর ছেড়েছিলেন—নাগর রসটুকু নিংড়ে দিয়েছেন খোলটা ফেলে—(বাঁকা হাসিয়া)—সেই যা হ'য়ে এসেছে মান্ধাতার আমল থেকে।

সুশীলা : বেশ বলেছিস সই! কেবল দুঃখ হয়—বিধাতা অবলাদের সরলা ক'রে গড়লেন কেন? এত ঠ'কেও তবু আমাদের চৈতন্য হয় না—বিশ্বাস করি এই ঠগের জাতকে!

সরলা (ঝঙ্কার দিয়া): আ—হা! ম'রে যাই! যেন এক হাতে তালি বাজে: মেয়েরা সব স্বর্গের সুজাতা আর ছেলেরা নরকের নায়েব! বলি, কোনো পুরুষের সাধ্যি আছে সে-মেয়ের কাছে ঘেঁষবার—যে চায় না পুরুষের সোহাগ? দুষতে যদি হয়ই—দুজনকেই দোষ দে—আধাআধি।

সুশীলা (রুষ্টা): আধাআধি? ক্ষ্যাপা না পাগল? আমরা হ'লাম দুর্বল যেন লাউডগা—ওরা শক্ত যেন গাছের গুঁড়ি।

সরলা: নরম মাটিতেই বেড়ালে দুষ্কর্ম করে। দুর্বল হ'য়ে বলব "সখী, ধরো ধরো"!—অথচ ঘা খেলে পড়ব না এ দুইই হয় না। তা ছাড়া পুরুষও কি বলতে পারে না বাঁকা হেসে: দুর্বল মানেই তো আস্কারা দেওয়া গো!

সুশীলা: আস্কারা? এমন কথা উচ্চারণ করিস?

সরলা (গম্ভীর হইয়া): আচ্ছা সুশীলা! এখানে বাইরের কেউ নেই—মেয়েতে মেয়েতে কথা হচ্ছে। ঢঙ রেখে বল্ তো আমাকে—বল্ বুকে হাত দিয়ে—যে-সব ছেলেদের তুই আস্কারা দিতে চাস নি তাদের একজনো কি কোনোদিন সাহস করেছে তোর ছায়া মাড়াতে? পুরুষ স্বভাবে লোভী ব'লে তাকে এককথায় জাহান্নমে পাঠানো সোজা—কিন্তু সে-লোভকে প্রশ্রয় দেন কিনি? ফুল পাঁপড়ি না মেললে পারে কোনো মৌমাছি তার মৌ-এর নাগাল পেতে?

সুশীলা (ক্রুদ্ধ): পারে না? কে বলে? হুল ফুটিয়ে ওরা পাঁপড়ি খোলে—মধুকাঙালের দল! দুনিয়ায় এমন কিছু আছে না কি যা ওরা আদায় করতে না পারলে বলে: হার মেনেছি?

সরলা (ফিক করিয়া হাসিয়া): তা ভাই, সবার বরাৎ কিছু সমান নয়—মানছি। আমার কর্তা আমার কাছে কিছু আদায় করতে চাইলে বড়জোর চোখ ফুটিয়েছেন—কিন্তু হুল ফোটান নি কোনোদিন।

সরলা (জ্বলিয়া): তুই আবার অপরকে বলিস "অশ্লীল"!

সুশীলা: যা বলেছিস। বেহায়া না হ'লে কি একটা বেহায়া নষ্ট মেয়ের জন্যে কারুর প্রাণ ডুকরে কেঁদে ওঠে!

সরলা: ছি ছি—আমাকে যা ইচ্ছে ব'লে গাল দে—কিন্তু নিদ্রিতা মীরার মুখের দিকে চাহিয়া) একবারটি চেয়ে দেখ্ দেখি—কী ভাবে, আহা, ওর গোপালকে আঁকড়ে ধ'রে শুয়ে আছে ভক্তিমতী—একলাটি, বিদেশে, বিভূঁয়ে—গাছতলায়!

সুশীলা (মুখ বাঁকাইয়া): ঢ—ঙ্ দেখে আর বাঁচি নে। একটা পুতুলকে আঁকড়ে শুয়ে থাকলেই—ভক্তিমতী! (তীক্ষ্ণকণ্ঠে) মুখে যার লজ্জার লেশ নেই—পথে পথে ঘোমটা ফেলে গান গেয়ে বেড়ায়—ভিক্ষে করে—এর নাম যদি হয় ভক্তিমতী তবে তেলাপোকাও পাখি!

সরলা (মুখ টিপিয়া হাসিয়া): ভাই, ঘোম্‌টার গুণকীর্তন করিস তাদের কাছে যারা ভুলবে। কিন্তু আমি যে মেয়ে লো—আমার কাছে লজ্জাবতী লতা সাজা কেন বল্ তো?

সুশীলা: লজ্জাবতী? মানে? কী বলতে চাস তুই? যে, আমরা মেয়েরা নির্লজ্জ?

সরলা (ফিক করিয়া হাসিয়া): আচ্ছা সুশীলা, আমাকে বল্ তো তোর বুকে হাত দিয়ে—আমরা ঘোমটা টানি কি ওদের না-করতে, না উস্কে দিতে? তবে বোধ হয় যারা পাকে পড়ে তাদের বুঝতে সময় লাগে। তাই পুরুষ ভাবে সে-ই মালিক, জিৎল, কেননা আদায় করে সে-ই তো। কিন্তু মেয়েরা শেয়ানা—হাসে মুখ টিপে, জানে—ওস্তাদের

মার শেষ রাত্রে, যা বায়না দিল ফিরে আসবে শুদ সুদ্ধু—যখন টোপ গিলে কাৎরাবেন প্রভুর দল। ওরা আমাদের দেহ কেনে মনের, মোহের দাম দিয়ে। ভিতরে ভিতরে একথা না জানে কোন্ মেয়ে যে ওরা যতই ভালোবাসে ততই বিশ্বাস করে- আর আমরা যতই ভালোবাসি ততই করি সন্দেহ। (মুচকিয়া হাসিয়া) সবলার মুখোষ প'রে অচলা নাম কিনতে চাস তো যা পুরুষের বাজারে—যারা ঠেকবে, ঠকবে তবু শিখবে না। কিন্তু ময়ূরের পালক প'রে কি কাক কোনোদিন পেরেছে কাককে ভোলাতে?

সরমা : আস্পর্ধা—
সুশীলা : জিভ খ'সে পড়বে—তুই—তুই—তুই—
কমলা : চল্ চল্—ঘাটে যাই—কী হবে অনর্থক ঝগড়া ক'রে!

রাগে গরগর করিতে করিতে প্রস্থান

মীরা (চিৎকারে ভয় পাইয়া উঠিয়া বসিয়া) : আমি কোথায়?

সরলা (কাছে আসিয়া ঝুঁকিয়া) : বৃন্দাবনে দিদি!

মীরা (সরলার দিকে বিহ্বল ভাবে চাহিয়া) : উঃ—আমার মাথার মধ্যে কেমন করছে!

পুনরায় শয়ান

সরলা (মীরার কপালে হাত রাখিয়া সস্নেহে) : উঃ—গা যে পুড়ে যাচ্ছে!—আমি এক্ষুনি যমুনা থেকে জল এনে জলপটি—

মীরা (চোখ মেলিয়া) : না না। কিছু দরকার নেই। জ্বর আমার গা-সওয়া হ'য়ে গেছে। (সরলার দিকে একদৃষ্টে তাকাইয়া) তুমি…তুমি কে ভাই?

সরলা (মীরার শিয়রে বসিয়া): আমার নাম সরলা। ঐ বেলগাছটা না? ওর সাম্‌নেই আমার বাড়ি। যাবে আমার ওখানে?

মীরা (মাথা নাড়িয়া): না ভাই, আমি বড় অপয়া। যেখানেই যাই আনি ঝড় তুফান। (দীর্ঘনিশ্বাস) তাই যদি নিজের ভালো চাও আমার ছায়াও মাড়িও না।

সরলা: অমন কথা বলে না দিদি!—তোমাকে দেখে কেন জানি না মায়া করে। চলো আমার ঘরে—লক্ষ্মীটি!

মীরা (ম্লান কণ্ঠে): না ভাই, আমি কারুর ঘরে যাই না—গোপালের বারণ। কারণ বোধহয় এই যে—কিন্তু সে থাক্—তুমি বুঝবে না। শুধু বলি—তাকে দয়া করা ভালো নয় (চোখে জল) যার ছায়া গোপাল মাড়ান না—যাকে তিনি দু বৎসর এমন কি স্বপ্নেও দেখা দেন নি। তবে হয়ত দোষ আমারি—তাই চেয়েছিলাম চাঁদ ধরতে। এক সময়ে এমনও মনে হয় যে এজগতে থাকতে হ'লে হয়ত কালোর সঙ্গে সই-পাতানোই ভালো—আলো যখন নাগালের বাইরে।

সরলা (কোমল কণ্ঠে): এমন কথা বলতে নেই ভাই। এজগতে আলোর চেয়ে কালো বেশি মানি—কিন্তু তবু এমন দুর্ভাগা কি কেউ আছে যে তার জীবন দিয়ে একটি বাতিও জ্বালতে পারে না?—আর যদি কেউ এমন একটি বাতিও পারে জ্বালাতে তবে আঁধার অথই ব'লে কি আলোর মর্যাদা কমে, না বাড়ে?

মীরা (উঠিয়া বসিয়া স্থির নেত্রে চাহিয়া): তুমি বোধহয় বিদুষী—তাই পেয়েছ জ্ঞানের সান্ত্বনা।...জানো? (দীর্ঘনিশ্বাস) আমিও একসময়ে বলতাম এই ধরনের জ্ঞানের কথা—দিতাম অনেককে সান্ত্বনা। তবে হয়ত তুমি আমাকে একটু ভুল বুঝেছ। জগতের কাছে আমি কিছু আশা করি না আর—কিন্তু তাই ব'লে আমি এখনো সব আশা ছাড়ি

নি। হয়ত···জীবনের এপারে পাব না তার দেখা যার জন্যে ঘর ছেড়েছি—কিন্তু এতে দুঃখ পেলেও সে-দুঃখের সবটাই ক্ষতি নয়—কেন না সে-দুঃখের প্রসাদেই কেটেছে আমার একটি মস্ত ভয়—মরণের।

সরলা (ক্লিষ্ট কণ্ঠে) : ছি ভাই, এমন অলুক্ষুণে কথা মুখেও আনতে নেই। তাছাড়া তাঁকে যে পেয়েছে তাকে তিনিই রাখেন—আর যাকে তিনি রাখেন তাকে মারে কে? তুমি চলো আমার ঘরে—লক্ষ্মীটি! আমি তোমার সেবা করব।

মীরা (আর্দ্র কণ্ঠে) : মনটি তোমার নরম ভাই! গোপাল তোমাকে দয়া করেছেন তাই বুঝি এত দয়া তোমার! কিন্তু যে তাঁর দয়া পেয়ে হারিয়েছে তাকে দয়া করা ভালো নয়—করলে ভুগতে হবে। তাই বলি—যাও তুমি—যেখানে যাচ্ছিলে।

সরলা : কিন্তু তুমি যে অসুস্থ। তোমাকে দেখবে কে?

মীরা : (ম্লান হাসিয়া) : যিনি দেখবার। তিনি না দেখলে কেউ কি পারে দেখতে কাউকে? না ভাই, দুঃখ আমার আছে, কিন্তু ক্ষোভ নেই। কেন না দুঃখের মধ্যেও তো শুধু দুঃখই পাই নি—অচিন পথ বেয়ে এসেছে সান্ত্বনা।

সরলা (দুঃখিত সুরে) : যখন কিছুতেই যাবে না তখন কী আর করব? কিন্তু তোমার জন্যে কিছু রেঁধে আনছি—তুমি কথা দাও এখানে অপেক্ষা করবে?

মীরা : আচ্ছা দিদি। ··এই দেখ, কত ভাবে তিনি দেখেন—এক হাতে মারেন অন্য হাতে করেন আশীর্বাদ।

সরলা ঘাটের দিকে চলিয়া গেল। সঙ্গে সঙ্গে জল-ভরা-কলসী-কাঁকে সরমা, সুশীলা ও কমলার প্রবেশ

কমলা (মীরাকে উপবিষ্টা দেখিয়া) : তোমার নাম কি, মেয়ে?

মীরা (হাসিয়া) : যাকে কেউ চেনে না তার নাম নিয়ে কী হবে? যে-কোনো একটা নাম দিলেই চলবে।

সরমা (সুশীলাকে) : ওলো, কী নাম দিবি একে বল্ তো? আমি বলি—"কাঙালিনী"।

সুশীলা : কিম্বা "পাগলিনী"। (মীরাকে) কোন্‌টা তোমার পছন্দ মেয়ে?

মীরা (হাসিয়া) : দুটোই। কেবল একটা মুস্কিল আছে।

সরমা (ঠাহর না পাইয়া) : মুস্কিল!

মীরা (হাসিয়া) : কি জানো, কাউকে যদি "ত্রিনয়নী" ব'লে ডাকে তবে তার তবু একটা মিলে হয়। কিন্তু যদি বলো "দ্বিনয়নী"—তবে যে সবাই দেবে সাড়া। তেম্‌নি পাগলিনী ও কাঙালিনী। বুঝলে?

সরমা : তোর যতবড় মুখ নয় ততবড় কথা!—আমাদের বলিস কি না কাঙাল—তোর ম'তন? আমরা কারুর দোরে যাই না।

মীরা : তোমাদের দুর্ভাগ্য। কারণ কৃষ্ণের কৃপার যে কাঙাল নয়, তাঁর প্রেমের দোরে যে হাত পাতে না, তার চেয়ে শোচনীয় অবস্থা কার?

কমলা : শোচনীয়?

মীরা : নয়? যারা দেখেও দেখে না অথচ জানে না—তারা অন্ধ, বুঝেও বোঝে না অথচ টের পায় না—তারা অজ্ঞান?

সরমা (ক্রোধে জ্বলিয়া) : আর তুই? তুই কী—জানিস সেটা? যারা অন্ধ বা অজ্ঞান তারা তোর চেয়ে ঢের ঢের ঢের ভালো, বুঝলি? কারণ তারা তোর ম'তন ঘর ছেড়ে বেরিয়ে আসে নি লজ্জার মাথা খেয়ে। ঘোম্‌টা ফেলে রাস্তায় রাস্তায় ধেই-ধেই ক'রে বেড়াস—আবার চোপা?

মীরা হাসিযা সামনে-রাখা বিগ্রহের দিকে কটাক্ষ করিয়া গান ধরিলেন :

কেন আর লোকলাজ ভয় সখী, কেন ভয় লোকলাজ—
ঘুচালো কুণ্ঠাগুণ্ঠন যবে প্রেমপাগলিনী আজ ?
লক্ষ হৃদয় নয় তো—কেমনে বিলাই লো জনে জনে—
বিকাযে এ-তনুমন শির যবে লুটায়েছি শ্রীচরণে ।
গেছি ভুলে যবে সখা, সন্তান, পিতামাতা গৃহকাজ
কেন আর লোকলাজ ভয সখী, কেন ভয়, লোকলাজ ?

ওরা চাহিল পরস্পরের দিকে—রাগ ভুলিযা মীরার কণ্ঠস্বরে মোহিত হইয়া শুনিতে লাগিল মীরার তন্ময় গান :

নিরালাই পায নিরালারে—যবে দুই এক হ'তে চায ।
প্রেমের সরণি দুর্গম—নাই "আমি"র ঠাঁই সেথায় ।
সে-পথের সহযাত্রী নয় তো ধনী মানী মহারাজ ।
কেন আর লোকলাজ ভয সখী, কেন ভয, লোকলাজ ?

গাহিতে গাহিতে ভাবাবেশে মীরা উঠিযা দাঁড়াইলেন ও বিগ্রহকে পরিক্রমা করিয়া নৃত্যভঙ্গিতে গাহিযা চলিলেন :

কেহ বলে আমি "কলঙ্কী", বলে কেহ বা "পাগল" হাসি'
মীরার কণ্ঠে নামমালা, জগতের গলে—মায়াফাঁশি ।
অমূল জনম কেমনে কাটাস্ পরিয়া মিথ্যাসাজ ?
কেন আর লোকলাজ ভয সখী, কেন ভয়, লোকলাজ ?

মীরার গান শেষ হইতে ওদের চমক ভাঙিল । ওরা চাহিল এ উহার মুখপানে—ঈষৎ অপ্রতিভ ভঙ্গিতে

সরমা (ব্যঙ্গের সুরে) : বটে ? আমরা অমূল্য জন্ম কাটাচ্ছি মিথ্যা ছেলেখেলা ক'রে আর উনিই উজান চলেছেন দেবী হ'য়ে নামের মালা গলায় দুলিয়ে ?

কমলা : চল্ ভাই চল্। মিথ্যে কেন এক রাস্তার মেয়ের সঙ্গে তর্ক ক'রে মন খারাপ করা? বেলা হ'ল—ঘরের সব কাজই বাকি।

সুশীলা : চল্ যাই—কেবল যাবার আগে দুটো মধুমাখা কথা শুনিয়ে দিয়ে যাই মধুহাসিনীকে। (মীরার দিকে চাহিয়া তর্জনী উত্তোলন করিয়া) দেখ্ মেয়ে! তুই আমাদের গান ক'রে যে সব মিষ্টি কথা শোনালি—আমরা তার চেয়েও মিষ্টি কথা তোকে বলতে পারি ঘরোয়া ভাষায়। তোকে দেখে প্রথমে দয়া হয়েছিল—কিন্তু অপাত্রে দয়াও পাপ বলেছে কি সাধে? হাজার ধুলেও ছাই হয় না শাদা। না—ছাই তো তবু পদে আছে: তুই ছাইয়ের চেয়েও কালো—তুই পাঁক—তুই আঁস্তাকুড়—তুই—তুই মূর্তিমান পাপ—তার উপর পুণ্যের মুখোশ প'রে জাঁক করিস যে কারুর কারুর পাপ পুণ্যের চেয়েও বড়। (শাসনের সুরে) কিন্তু মনে রাখিস—নিজেকে ঠকানো যত সহজ অপরকে ঠকানো ঠিক তত সহজ নয়। চিত্রগুপ্ত তোর প্রতি কুকর্মের কাহিনী লিখে রাখছে: সে ভুলবে না তোর গানের ভণ্ডামিতে—মারবে ডাঙশ তোর মাথায় ভগবান্‌কে ভালোবাসার ভান করার জন্যে। চল্ সরমা, আয় কমলা! আর একবার স্নান ক'রে তবে ঘরে ফিরব।

বলিয়া রাগে গরগর করিতে করিতে ও অঙ্গভঙ্গি করিতে করিতে ওরা চলিয়া গেল ফের ঘাটের দিকে। মীরা একদৃষ্টে চাহিয়া রহিল তাহাদের পানে।...খানিকক্ষণ এই ভাবে কাটিল...সূর্যালোকে মীরার মুখে বিন্দু বিন্দু ঘাম ফুটিয়া উঠিল। কিন্তু মীরার খেয়াল নাই, সে একদৃষ্টে চাহিয়া রহিল বিগ্রহের পানে। তাহার চোখে জল ভরিয়া আসিল।

মীরা (সাশ্রুনেত্রে): গোপাল! তুমি কোথায়? তুমি কি আছ কোথাও? তুমি কি শুনতে পাও? ...শুনি গাছ থেকে একটি পাতাও পড়ে না তোমার অনুমতি বিনা। তবে এরা যে আমাকে যা মুখে

আসে তাই ব'লে অপমান ক'রে গেল এতেও কি তোমার সায় আছে? (মাথা নাড়িয়া, অশ্রু মুছিয়া) না, আমি ভালোবেসে যাকে টলাতে পারি নি চোখের জলে তার মন গলাবার চেষ্টা করব না। আর তা ছাড়া···কে জানে···হয়ত বাঁধন আমার কাটত না আঘাত না পেলে! হয়ত এ-ছাড়া পথ ছিল না আর—খুলত না আমার চোখ—শুধু অপরের সম্বন্ধেই নয়—হয়ত আমি ··হয়ত আমি—(চমকিয়া)—কে জানে হয়ত আমি সত্যিই তাই যা ওরা বলল! হয়ত আমি ভালোবাসিনি তোমাকে—শুধু ভান করেছি ভালোবাসার। (বিগ্রহের দিকে চাহিয়া) ওই একটি মাত্র অভিমান ছিল আমার সান্ত্বনা গোপাল, কিন্তু তাও তুমি নিলে কেড়ে। হয়ত তাই তুমি চ'লে গিয়েছ আমাকে ছেড়ে—স্বপ্নেও দাও না দেখা একটিবার। (চোখ জলে ভরিয়া আসিল) কেবল একটা প্রশ্ন আমার আছে গোপাল! আমি যা-ই হই আমি তো তোমারি শরণ নিয়েছিলাম—যা-ই ক'রে থাকি—তোমারি কথায় তো ছেড়েছিলাম যা কিছু মানুষ ভালোবাসে!—দিনের পর দিন অনাহারে অনিদ্রায় চেয়েছি তো তোমাকেই প্রভু! ইচ্ছা করলে আমি তো ফিরে যেতে পারতাম আমার বাবার কাছে। তিনি আমাকে ফেলতে পারতেন না। কিন্তু কেন এমন হ'ল—জগতের সব স্নেহ, সব প্রীতি, সব হাসি হ'য়ে গেল কালো আমার চোখে? অপরূপ লীলা তোমার নাথ!

আপন মনে গাঢ়কণ্ঠে মীরা গান ধরিলেন:

এ কেমন লীলা বন্ধু তোমার, কে পেয়েছে দিশা তার?
মিলনের পথে কাছে ডেকে এ কী দূরে ঠেলা বারবার!

ঝরাযে আঁখি কে হাসিতে শেখালো? সব পেতে প্রাণ সকলি হারালো!
যারে চাই তার মাঝে কে মজালো—এলো জয় মেনে হার!
মিলনের পথে দূরে ঠেলে এ কী কাছে ডাকা বার বার?

প্রিয় পরিজন হ'ল সবে পর। পারি না চিনিতে চিরচেনা ঘর।
"কেহ নয় তোর আপন"—এ-স্বর অন্তরে বাজে কার?
মিলনের পথে কাছে ডেকে এ কী দূরে ঠেলা বার বার!

নাই সখী, আর লোকলাজ ভয়, নাই সাথী কেহ, নাই আশ্রয়,
ভালোবাসি—যার নাই পরিচয়, অদেখার অভিসার!
মিলনের পথে দূরে ঠেলে এ কী কাছে ডাকা বার বার।

গানের শেষে মীরা ক্লান্ত হইয়া গাছতলায় পুনরায় শুইয়া পড়িল বিগ্রহটি বুকে করিয়া। পরে "হরে কৃষ্ণ হরে কৃষ্ণ কৃষ্ণ কৃষ্ণ হরে হরে" জপ করিতে করিতে ঘুমাইয়া পড়িল।

দুটি চোরের প্রবেশ—যদু মধু

যদু (হঠাৎ মীরাকে দেখিয়া): আহা! দেখ্ দেখ্ মোধো!—ভিখিরির বেশ—কিন্তু ভিখিরি তো নয়। যেন পাঁকে পদ্মফুলটি!

মধু: যোদো! ফে—র! এত ঠেকিস তবু শিখবি নে? ভিখিরি মেয়েকে নিয়েও উচ্ছ্বাস?

যদু (মীরার দিকে চাহিয়া): এ ভিখিরি নয় রে, এ কোনো বড়-ঘরের মেয়ে—তোকে ব'লে দিলাম।

মধু (মীরার কাছে আসিয়া ঝুঁকিয়া): ওরে! দেখ্ দেখ্—ওর বুকে বালগোপালের চমৎকার বিগ্রহ! যোদো রে! তোর কথা একবার অন্তত ঠিক হয়েছে—এ বড়ঘরের মেয়েই বটে। দেখ্ তো—বিগ্রহের কানে কী! (সহসা অস্ফুট চিৎকার করিয়া) এ যে হিরে রে—আসল হিরে।

যদু (ঝুঁকিয়া): তাই তো!

মধু (সোল্লাসে): যোদো! ভগবান্ আছেন—তোকে বলেছি কতবার—অথচ এমন অবিশ্বাসী তুই যে বিশ্বাস করবি নে। আমাদের

কপাল ফিরল—আর চুরি ক'রে খেতে হবে না। এবার আমরা রইস হ'য়ে বসব। তুই ধর্ ওর হাত চেপে, আমি বিগ্রহটা টুপ্ ক'রে সরিয়ে চম্পট দিই ও জাগবার আগেই।

যদু (তার হাত চাপিয়া ধরিয়া): না।

মধু (সবিস্ময়ে): না কি রে?

যদু: না। পাপ করেছি ঢের—আর না। ওকে দেখে আমার মনে হ'ল···মা!

মধু (হাসিয়া): যোদো! কে—র? স'রে দাঁড়া বলছি! যদি শুভকাজে সহায় হ'তে না পারিস—অন্তত বাগড়া দিস নে।

যদু: না। ওর গায়ে তোকে দেব না হাত দিতে। ওর মধ্যে আমি দেখছি সাক্ষাৎ মা লক্ষ্মীকে—

মধু: দেখ্ যোদো! পাগলামি করিস নে—স'রে দাঁড়া।

বলিয়া হেঁট হইয়া মীরার বাহুবদ্ধ বিগ্রহ টানিতেই মীরার ঘুম ভাঙিয়া গেল

মীরা (চিৎকার করিয়া): কে? কে?—এ কী? না না—আমি—আমি—

মধু বিগ্রহ ছিনাইয়া লইবার উপক্রম করিতেই যদু তার হাত চাপিয়া ধরিল। মধু চক্ষের নিমেষে তাহাকে ধাক্কা দিয়া ভূমিসাৎ করিল।

মীরা (কাঁদিয়া): বাছা! আমার গোপাল—আমার গোপাল—

মধু: ছাড়্ বলছি—

বলিয়া ধাক্কা দিল মীরাকে—মীরা পড়িয়া গেলেন—এক পাথরের কোনায় বামদিকের রগ কাটিয়া দর দর করিয়া গণ্ড বাহিয়া রক্ত ঝরিতে লাগিল। যদু উঠিতে না উঠিতে মধু বিগ্রহ লুটিয়া পলায়ন করিল।

বধূ : কিছু ভেবো না মা। তোমার বিগ্রহ তোমার হাতে ফিরিয়ে দিয়ে তবে আমি জল গ্রহণ করব।

মীঁরা ধীরে ধীরে উঠিয়া বসিয়া বিহ্বলের ম'তন চাহিতে লাগিলেন চারি পাশে। গণ্ড বাহিয়া রক্ত ঝরিতেছে—কিন্তু তাঁহার যেন লক্ষ্যই নাই!

মীরা : কে—কে আমি?…মী—মীরা—মেবারের ম—মহারাণী? না, স্বপ্নে দেখেছিলাম আমি রাজরাণী—রাজরাণী হ'তে চেয়েছিলাম ব'লে? (চারিদিকে তাকাইয়া) আর এ কো—কোথায়? এ-ও কি স্বপ্নে দেখা, না সত্যি?…(মাথা নাড়িয়া) না, আমি তো ঘুমিয়ে নেই—ঐ তো যমুনা—এই তো বৃ—বৃন্দাবন। আমি কি চোখে ভুল দেখছি? ঐ তো কোকিল গাইছে! কানে ভুল শুনছি? (পুনরায় মাথা নাড়িয়া) না—এই তো সেই বকুলগাছ—পায়ের কাছে কত ঝরা বকুল! ভুল হবে কেমন ক'রে? মনে পড়ছে তো এখনো পরিষ্কার—যেন কালকের ঘটনা—গোপালের সেই বলা: যাও তুমি বৃন্দাবন—তোমার গুরুর কাছে।…(ব্যাকুল কণ্ঠে) কিন্তু কই? কোথায় গোপাল? গোপাল! গোপাল! (তারস্বরে) কোথায় তুমি গোপাল? আজ তেইশ বৎসর তুমি আমার কাছছাড়া হও নি যে! আজ কোথায় গেলে? শেষে কিনা চোরে আমাকে ধাক্কা দিয়ে ছিনিয়ে নিয়ে গেল—(কাঁদিয়া)——তোমাকে—গোপাল তোমাকে। আমার যে আর কিছুই নেই—গোপাল! যা ছিল সব গেছে তোমাকে চেয়ে—শেষে তোমাকে হারিয়েছি আজ দুবৎসর। ছিল একটি মাত্র সম্বল—তোমার বিগ্রহ—যে মনে করিয়ে দিত তোমাকে—তাকেও তুমি কেড়ে নিলে! শুনি সব সম্পদের অধিরাজ তুমি—শুধু তুমি। সেই তোমাকে যে ভজনা করে সে কেমন ক'রে হয় সর্বহারা, অনাথ? বলব কি এতদিন ছিলাম

একটা মনগড়া মোহের স্বর্গে? কিন্তু তা তো নয় গোপাল! আজ তেইশ বৎসর ধ'রে তোমাকে কাছে পেয়েছি দিনের পর দিন। আমার বিষ তুমি গ্রহণ করেছ।.. (দীর্ঘনিশ্বাস) কিম্বা এ সবই চোখের ভুল, মনের ভুল!...(উপরে চাহিয়া) কে? তুমি কোকিল? তাঁর নামগুণগান করছ? সাবধান বন্ধু! একদিন আমিও করেছি তাঁর নাম আর তোমার চেয়ে আরো সুন্দর, আরো বিচিত্র সুরে। কিন্তু দেখ আজ আমার দশা। গেয়ো না আর তাঁর নামগান—যদি ভালো চাও।...(নিজের হাতের দিকে তাকাইয়া) এ কার হাত? মহারাণী মীরাবাইয়ের—যে ছিল মহারাণী, হ'ল পাগলিনী—ভিখারিণী তার জন্যে?—যে পথে পথে খুঁজেছিল তাঁকে যাকে কোথাও মেলে না?.. (চারিদিকে তাকাইয়া) সবই আছে কেবল নেই আমার গোপাল—আমার তেইশ বছরের সঙ্গী, সাথী, বন্ধু, দিশারি!.. (অশ্রুরুদ্ধপ্রায় কণ্ঠে) গোপাল! গোপাল! কোথায় তুমি? কেন তুমি এসেছিলে, বলেছিলে—আমাকে ভালোবাসো? এ কেমন খেলা তোমার? তুমি বলেছিলে আমাকে তুমি ভালোবাসো যেমন আকাশ বাসে পাখিকে, আলো ফুলকে, সমুদ্র মাটিকে। কিন্তু আমাকে কোথায় টেনে আন্‌ল এ-ভালোবাসা? দুঃখ হ'ল প্রতিপদের জপমন্ত্র, অপমান—প্রতিদিনের নগদবিদায়, নিরাশা—আশুম কণ্ঠমালা।...শুনি—তুমি জ্যোতিঃস্বরূপ। তবে কেন আলোর শিখর চেয়ে নামতে হ'ল আমাকে অতল অন্ধকারে? তুমি বলতে আমাকে—"যাও গুরুর কাছে, তাঁর মাঝে আমাকে দর্শন করতে"—কিন্তু দিশা দিয়েই মিলিয়ে গেল দিশারি! দিনের পর দিন, রাতের পর রাত, মাসের পর মাস শুধু বুকভরা তৃষ্ণাই রইল আমার নিত্যসাথী—মিলল না জল—তোমার দর্শন স্পর্শন—স্বপ্নেও এলে না তুমি একটিবার! শুধু একটি শিক্ষা

দিলে—যে, বেদনার নেই তল, অপমানের নেই সংখ্যা, নিরাশার নেই পার। তুমি শক্তি দিলে বইবার—শুধু বেশি ক'রে সওয়াতে।···তবু এই নিষ্ঠুর লীলা তোমার চলেছে আবহমানকাল বিশ্ব জুড়ে—তোমার কোকিল আজো গান গায়, ফুল ফোটে, পাতা দোলে, ঢেউ ব'য়ে চলে। কেন? শুধু এ মায়ার খেলা খেলাতে আমাদের দিয়ে—আমাদের মনকে বিশ্বাস করিয়ে যে এ-প্রাণলোক আনন্দের বসতি, রূপের রাজধানী?···(আকাশের দিকে চাহিয়া) কিন্তু প্রশ্ন করছি কার কাছে? যে শুধু নিজে বিদায় নিয়েই ক্ষান্ত হ'তে পারে নি—ছিনিয়ে নিল আমার শেষ সম্বল—ইষ্টবিগ্রহ—আমার তেইশ বৎসরের নিত্যসঙ্গী! (অশ্রু মুছিয়া টলিতে টলিতে যমুনার দিকে চলিতে চলিতে) তবে আর কেন? এইখানেই পড়ুক যবনিকা···যাকে সবাই ছেড়েছে সে জীবনকে আঁকড়ে থাকবে কিসের আশায়? (যমুনার পাড়ে একটি ছোট ঢিবির উপর চড়িয়া উত্তেজিত স্বরে) ঐ যে ডাকছে যমুনা!···আমি যে স্পষ্ট শুনতে পাচ্ছি—ঠিক যেমন মানুষে কথা কয়! বলছে: "আয় রে ক্লান্ত, আয় রে অশান্ত—ফিরে আয় আমার বুকে—জুড়োতে। অন্ত বিনা নেই শান্তি—দীপ যতক্ষণ জ্বলে চঞ্চল শিখা আলোর চেয়ে ছায়াই বেশি বিলোয়। বেলা গেল—আয় ফিরে ঘুমের বুকে।" (আকাশের দিকে চাহিয়া) বেশ। এ-নিষ্ফল জীবনের হোক অবসান। কেবল···(করযোড়ে) এই শেষ প্রার্থনাটি যেন তোমার চরণে পৌঁছয় প্রভু: তোমাকে দূষেছি আমি বড় দুঃখে। দুঃখিনীর অপরাধ নিও না। আমরা অবোধ অজ্ঞান···তোমাকে বুঝতে পারি না ··পারব কেমন ক'রে? কিন্তু তুমি তো নাথ, অন্তর্যামী—জানো প্রতি তৃণটির প্রাণের ব্যথা · জানো—অন্ধকারের বন্দীরা কেন আলোকে দোষ দেয় নিষ্ঠুর ব'লে···জানো—কেন প্রাণ যাকে অঙ্গীকার করে মন করে অস্বীকার—কোন ক্ষোভের মোহে।

তাই আমার সব অপরাধ আজ ক্ষমা কোরো তুমি এইটি মেনে যে, আমি মুখে যা-ই বলি না কেন মনে তো জানি—তুমি কে—কেমন তোমার কৃপা। দিনে দিনে আরামে যত নিশ্বাস নিই মনে থাকে না—শুধু যে নিশ্বাসটি নিতে ব্যথা বাজে তাকে ভুলতে পারি না, বলি—কী নিষ্ঠুর অবিচার! এইভাবেই গড়া আমাদের স্বভাব-অকৃতজ্ঞ মন প্রাণ বুদ্ধি বিচার।...এই অন্তিম মুহূর্তে আমি শুধু তোমার কাছে অকপটে স্বীকার করছি—সব দোষ আমারই—চাইছি ক্ষমা। অঙ্গীকার করছি—যা পেয়েছি সে আমার প্রাপ্যর চেয়ে অনেক বেশি। কিন্তু যা পাই নি আমি তার যোগ্য নই ব'লেই জানাই প্রার্থনা—তুমি মঞ্জুর কোরো—দিও তোমার কৃপা। শক্তিমন্ত যারা তাদের তো নেই পাথেয়ের অভাব—কিন্তু যে সবহারা অসহায় সে কার মুখ চেয়ে থাকবে—তোমার কৃপার ছাড়া? আজ আমি হারিয়েছি সেই কৃপা...কিন্তু তাকে যেন ফিরে পাই যখন.. যখন জীবনের শেষ স্ফুলিঙ্গ নিভে যাবে আমার দেহের দীপাধারে। আর...তার পরে.. যদি আবার কোনোদিন তোমার এই শ্যামল জগতে জন্ম নিই তবে এই কোরো যেন তোমাকে না দূষি যখন তুমি আমাকে মিথ্যা থেকে উত্তীর্ণ করতে আসবে সত্যলোকে—আলেয়া থেকে আলোতে—গরল থেকে অমৃতে। এ-জীবনে পাই নি আমি সে-সত্য, সে-আলো, কেন না আমার স্বভাব পারে নি—চায় নি—কৃতজ্ঞ হ'তে—আমি-যে চাই নি আলোকে মনে প্রাণে—চেয়েছিলাম মোহের অন্ধকারকেই আঁকড়ে থাকতে। নৈলে কি ভাবতে পারতাম—তুমি নিষ্ঠুর? বলতে পারতাম—হীনমতির মত'ন—যে, তোমাকে ভালোবাসব সুখ পেলে তবেই—নৈলে নয়?...প্রভু, আমাকে দুঃখ দিয়েছ তুমি অশেষ কিন্তু দিয়েছ তো শুধু আমারি মঙ্গলের জন্যে—আমারি চোখ খুলতে। তাই তো আমি দেখতে পেলাম শেষের দিনে যে আমি শুধু

মুখেই বলেছি চাই দিশা। নৈলে কি যখন মিলল দিশা—যখন তুমি দেখিয়ে দিলে—তোমাকে ভালোবাসতে হ'লে চাই আমার আমি-কে বিসর্জন দেওয়া—তখন বলতে পারতাম: "না—আমি চাই আমার সুখকেই—তোমার বিধানকে নয়"— জপ করতাম—আমি কী চাই—তুমি কী চাও না-ভেবে? তাই বুঝি তুমি বুঝিয়ে দিলে আঘাত দিয়ে যে কাঙালিনী আর শরণার্থিনী এক বস্তু নয়? দেখিয়ে দিলে আমার নিজমূর্তি চোখে আঙুল দিয়ে? (অশ্রুরুদ্ধপ্রায় কণ্ঠে) নিজের এ-রূপ আমি আর সইতে পারছি না প্রভু! তাছাড়া কী হবে আর এ-ব্যর্থ জীবনের ভার ব'য়ে? যমুনায় হোক তার চরম সমাপ্তি—জীবনে হয় নি যার পরম প্রাপ্তি।·· আমি জানি না নাথ, ওপারে কী আছে—বা কিছু আছে কি না। কিন্তু তোমার চরণে এই প্রার্থনা জানিয়ে বিদায় নিতে চাই: যে, যদি তোমার জন্ম-জন্মের দাসীর আবার জন্ম হয় তবে যেন সে এমন মন নিয়ে জন্মায় যে বলতে পারে মনেপ্রাণে: "যদি তোমাকে পাওয়ার পথে শুধু দুঃখযন্ত্রণাই আসে প্রতিপদে—তবে সেই নীরন্ধ্র অন্ধকারকেই যেন বরণ করতে পারি ঐহিক সুখের লক্ষ দেয়ালি ছেড়ে।"

মীরা যমুনায় ঝাঁপ দিতে উদ্যত হইতেই দেখেন সামনে—স্বয়ং মুরলীমোহন—ত্রিভঙ্গঠামে!

মীরা (পতনোন্মুখ): গোপাল!···গোপাল!···

কৃষ্ণ (মীরাকে বাহুপাশে বদ্ধ করিয়া): মীরা!

মীরা (কৃষ্ণের স্কন্ধে মাথা রাখিয়া): গোপাল!—(সহসা জোর করিয়া নিজেকে মুক্ত করিয়া লইয়া) না! না—এ-ও নিশ্চয় মায়া—আমার চোখের ভুল···দেখা দিয়েছে আমাকে আরো অন্ধকারের

মধ্যে ফেলতে। আমার কাছে কেন আসতে যাবে তুমি···আমি তো তোমাকে পারি নি ভালোবাসতে!

কৃষ্ণ (হাসিয়া): সে কি? দেখ তো চারদিকে চেয়ে একবার।

মীরা (বিস্ফারিত নেত্রে): এ কী? এ কী? এ কী? (অসহ আনন্দে থর থর করিয়া তাহার সর্বাঙ্গ কাঁপিতে লাগিল) আমি কি স্বপ্ন দেখছি—না জেগে? তুমি বৈ যে কিছুই নেই আর! সব— স—ব তুমি, কৃষ্ণ, গোপাল, আনন্দময়!! প্রতি কাঁকরে তুমি, পাথরে তুমি, জলে স্থলে আকাশে বাতাসে—শুধু তুমি ··তুমি···তুমি!!! প্রতি তৃণে তুমি, ফুলে তুমি, পাতায় তুমি, প্রজাপতি তো নয়—তোমারি পাখা! কোকিলের সুরে তোমারই বাঁশি, ঐ বহুরূপীর চোখেও তোমার নীল দ্যুতি। এ কি? সেই দুটি চোরকে দেখতে পাচ্ছি—তারাও তুমি··· তারা ঝগড়া করছে কিন্তু তারা কোথায়? ঐ ঐ তুমি—তোমারি আর এক রূপকে ভূমিসাৎ করলে·· অন্যজন (তারস্বরে) সেটা নিয়ে ছুটে আসছে—এদিকে—এদিকে। গোপাল! এ সব কী দেখছি আমি? বলো—বলো—তোমার দুটি পায়ে পড়ি।

কৃষ্ণ (হাসিয়া): এমন কিছু নয়—তোমার বিগ্রহ তোমাকে ফিরিয়ে দিতে আসছে ও।

মীরা (সোল্লাসে): সত্যি? (করতালি দিয়া) কী আনন্দ! কী আনন্দ। তবে তো আমি শুধু নাচব, গাইব, হাততালি দেব।

কৃষ্ণ (ঊর্ধ্বপানে চাহিয়া দীর্ঘনিশ্বাস ফেলিয়া): আর আমি আকাশের দিকে তাকিয়ে হাহুতাশ করব যে, শেষে কিনা আমার বিগ্রহই জিতল—বড় হ'ল আমার চেয়ে!

মীরা: ব্যস্ গোপাল! আর না—সত্যি পেরে উঠছি না আর।

কৃষ্ণ: অধীনের অপরাধ?

মীরা (হাসিয়া) : সবাই বদ্‌লায়—শুধু তুমি বাদ।

কৃষ্ণ (সানুযোগে) : এমন কথা বলে—যখন আমি পদে পদে শিখছি কত কী—যদিও যতই শিখছি ততই দেখছি চোখে অন্ধকার।

মীরা : অন্ধকার? তোমার? যে-তুমি কেবল বাঁশি বাজাও—ডেকে আনো সরলাদের তোমার পায়ে—তার পর কী দশা করো তাদের—কানে বাজে আজো সেই গোপীদের কান্না (সুর করিয়া) :

কী মায়া জানে তব মুরলী জানো তুমি : স্বজন বান্ধব কান্ত সন্তান
সবারে ছেড়ে আমি নিশীথে ডাকে যার, আসিয়া দেখি—নাই তাহার সন্ধান!

কৃষ্ণ : হা হতোঽস্মি! যার জন্যে করি চুরি সেই বলে চোর : আমি তাদের কত ক'রে বোঝাতাম (সুর করিয়া) :

নিশীথে কুলবালা, এসেছ কেন বনে? যাও লো ফিরে ঘরে যেথায় সন্তান
কাঁদিছে "মা মা" ব'লে—পতি ও পরিজন করিছে সতীদের তাদের সন্ধান!

আমাকে তারা বাহাল করল তাদের নেচে গেয়ে আনন্দ দিতে—আর শেষে আমার উপরেই উল্টো চাপ!

মীরা : আনন্দই বটে! তবে বোধহয় ব্যথা যে পায় না কিছুতে, তাকে বোঝাতে যাওয়া বৃথা—ব্যথা কী বস্তু।

কৃষ্ণ (সবিস্ময়ে) : ব্যথা? কার? কোথায়?

মীরা (অতিষ্ঠ) : কার? কোথায়? চোখ দুটো কি মুখ-সাজানো? মুখ আমার রক্তে ভেসে গেল—দেখ তো—কপাল দব্‌ দব্‌ করছে—(কৃষ্ণের হাত ধরিয়া নিজের রগে ছোঁয়াইয়া)—ও মা! তাই তো! কী আশ্চর্য! একটুও ব্যথা নেই তো সত্যিই!

কৃষ্ণ (মীরার মুখ দু'হাতে ধরিয়া) : শুধু নেই—নয়—আর আসবে না ব্যথা। তুমি পৌঁছেছ আজ দুঃখের যন্ত্রণার কর্মচক্রের পারে।

এখন থেকে আর আমি যাব না তোমাকে ছেড়ে কোনোদিন—এক মুহূর্তের জন্যেও না।—কেবল, শোনো—মনে আছে তো আমার কথা? এখানে এসেছ তুমি কার জন্যে?

মীরা : আমার গুরুদেব—সনাতন?

কৃষ্ণ : অবিকল। আমি তাকে খবর দিতে চল্‌লাম।

মীরা (কৃষ্ণের হাত ধরিয়া) : না, তোমাকে আর বিশ্বাস করব না। না না না। ছাড়ব না আর।

কৃষ্ণ (চকিতে হাত ছাড়াইয়া লইয়া বালকের ম'তন ছুটিয়া একটু দূরে দাঁড়াইয়া) : কেমন? এবার? পারলে না তো ধ'রে রাখতে?

মীরা শোধ তুলিতে চাহিয়া মুখে মুখে একটি গান বাঁধিয়া গাহিলেন :

ধরবে তাকে কে—আছে যে বিশ্বভুবন মুঠোয় ধ'রে?
অবলা যে ত্রিলোকরাজে রাখবে বশে কেমন ক'রে?
শুধু বলি একটি কথা :
যাও যেতে চাও যথা তথা :
বন্দী তুমি রবেই তবু মীরার বুকে চিরতরে?
সেখান থেকে মুক্তি তুমি পাও দেখি নাথ, কেমন ক'রে!

কৃষ্ণ নৃত্যভঙ্গিতে তৎক্ষণাৎ জবাব দিলেন গাহিয়া :

কৃষ্ণ কবে চপল? সে যে চায় শুধু ঠাঁই চিরতরে
সেই হৃদয়ে—যে তাকে চায় রাখতে বেঁধে প্রেমের ডোরে।
লাজুক সে, তাই কয় না কথা,
মনেই রাখে মনের ব্যথা,
দূর থেকে হায় ডাকে যারা—কাছে গেলেই যায় যে স'রে :
হাত বাড়িয়ে হাতে পেলে দেয় ফেলে হায় কেমন ক'রে?—

কিন্তু ঐ আসছেন আমার এক সবে-পাওয়া ভক্ত—না জানি কী নালিশ নিয়ে। যঃ পলায়তি স জীবতি।

মীরা : যেয়ো না লক্ষ্মীটি! ওকে যখন ভক্ত বলছ তখন করো ওকে কৃপা।

কৃষ্ণ (হাসিয়া) : এখন থেকে মনে রেখো একটি কথা : তোমার কৃপা যে পাবে আমি তার মুঠোর মধ্যে।

কৃষ্ণ অন্তর্হিত হইলেন—সঙ্গে সঙ্গে বিগ্রহ-হস্তে যদুর পুনঃপ্রবেশ

যদু (বিগ্রহটি মীরার সামনে একটি পাথরে বসাইয়া) : মা, এই তোমার ধন তোমাকে ফিরিয়ে দিলাম।

মীরা (আর্দ্রকণ্ঠে) : বাবা! তুমি ছেলের কাজ করলে বটে!

যদু (নতমস্তকে) : তবে ছেলেকে আশীর্বাদ করো মা!

মীরা : আশীর্বাদ তিনি ক'রে গেছেন বাবা—এই মাত্র।

যদু (অশ্রুগাঢ় কণ্ঠে) : অসম্ভব মা! আমি যে চোর—তাঁর কৃপার অযোগ্য।

মীরা : বাবা! শোনো : কেউ নেই জগতে এমন কীর্তিমান্ যে বলতে পারে বড় গলা ক'রে যে সে তাঁর কৃপার যোগ্য। ঠিক্ তেম্নি—কেউ নেই জগতে এমন দুর্বৃত্ত যাকে কেউ তাঁর কৃপা-পাওয়া থেকে পারে বঞ্চিত করতে।

যদু (মীরার পায়ে পড়িয়া) : মা, আমি তাঁকে জানি না, জানি শুধু একটি কথা—যে, তুমি দেবী—এসেছ আমাকে উদ্ধার করতে।

মীরা : অমন কথা বলে না বাবা! আমি পথের ভিখারিণী, দোরে দোরে তাঁর নাম বিলিয়ে বেড়াই গান গেয়ে।

যদু (মৃদুহাস্যে) : মা, কেন ছলনা করছ? শুনবে তবে? খানিক আগে যখন আমি ঠাকুরের বিগ্রহ নিয়ে কাড়াকাড়ি করছিলাম আমার ছোট ভাইয়ের সঙ্গে তখন অজ্ঞান্তে একবার আমার হাত ঠেকে

খা'ন তোমাব গায়ে। সঙ্গে সঙ্গে আমি শুন্‌লাম স্পষ্ট একটা স্বর : "ওরে! চেযে দেখ্ : অগতিব গতি এসেছেন তোব কাছে মা লক্ষ্মীর বেশে!" (অশ্রুগাঢ় কণ্ঠে) নৈলে কি আমি পাবতাম আমাব মায়ের পেটেব ভাইয়ের পা ভেঙে দিতে তোমার জন্যে? কিন্তু ঐ কারা আসছে এদিকে। আমি একটু গাঢাকা হই—ওরা চ'লে গেলেই ফিরে শরণ নেব মা তোমার পায়ে।

যদু ডান দিকে প্রস্থান করিতেই রাও রাজা রতন সিংহের প্রবেশ বাঁদিক হইতে—রতন সিংহের ঠিক পিছনে রাজপুরোহিত মদন

মীরা (সোল্লাসে) : এ কী! বাবা!
রতন সিং : শেষে মিলল আমাব নয়নতাবা!

রতন সিং ছুটিয়া আসিয়া মীরাকে বাহুপাশে আবদ্ধ করিলেন, খানিক বাদে তিনি মীরাকে ছাড়িয়া দিয়া হাতের আস্তিনে চক্ষু মুছিলেন

মীরা : কেমন ক'রে—

রতন সিং : মা! শেষে তোমার এই দশাও দেখতে হ'ল! হায় রে হায়...!

কপালে করাঘাত

মীরা : (হাত চাপিয়া ধরিয়া) : দুঃখ করবেন না বাবা! যা কিছু ঘটে—তাঁরই ইচ্ছায়। এ-ছাড়া আর কিছু যে হ'তেই পারত না।

রতন সিং (মাথা নাড়িয়া) : মিথ্যে সান্ত্বনায় কাকে ভুলোচ্ছ মা? তোমার এ-দশা কি আজ হ'তে পারত যদি আমি তোমার শত্রু না হ'য়ে হ'তাম সত্যিকার পিতা?

মীরা : এমন কথা মুখে আনতে নেই বাবা! ছি! আপনার ম'তন স্নেহময় পিতা কজন পায়?

রতন সিং (দুহাতে মুখ ঢাকিয়া) : অন্ধ—অন্ধ—অন্ধ—

মীরা (দৃঢ় কণ্ঠে) : না বাবা ! আপনার যে অন্ধ না হ'য়েই উপায় ছিল না। কারণ আপনি অন্ধ না হ'লে কি আমার চোখ খুলত কোনোদিনো ? আমি থাকতাম আজো সেই স্বপ্নের, মায়ার রাজ্যে—তাঁর ছায়াকে কায়া ব'লে ভুল ক'রে।

রতন সিং : মায়া তোমাকে ভোলায় নি মা, ভুলিয়েছে আমাকে। তাই তো আমি গোপাল সেজে তোমাকে প্রবঞ্চনা ক'রে দিয়েছি তোমার বিবাহ।

মীরা : এ-প্রবঞ্চনারও প্রয়োজন ছিল—নৈলে গোপাল কি তাকে স্বীকার করতেন বাবা ?

রতন সিং : প্রয়োজন ? প্রবঞ্চনার ?

মীরা : আপনিই কি বললেন না এই মাত্র যে আপনি গোপাল সেজে আজ্ঞা না দিলে আমি বিবাহ করতাম না ?

রতন সিং : আর এই দশাও তোমার হ'ত না তাহ'লে।

মীরা : এর নাম কি দশা ? না এ ভাগ্য ? ভাবুন তো—কৃষ্ণের নামে ভিখারিণী ! আপনি আমাকে বিবাহ করতে বাধ্য না করলে আমি আজো থাকতাম আপনার প্রাসাদে বিলাসের দুলালী। (সগর্বে) বাবা ! রাজাও ঢের জন্মায়, রাজরাণীও ঢের জন্মাবে। কিন্তু কৃষ্ণের নামে সর্বহারা হবার ভাগ্য কোটিতে গোটিক হয়।

রতন সিং : এ'কে ভাগ্য বলো তুমি ! আমি অন্ধ হ'তে পারি কিন্তু অবোধ নই মীরা ! তোমাকে দেখা সর্বহারা ভিখারিণী···মুখ রক্তে ভেসে যাচ্ছে···উপবাসে শীর্ণ দেহ, শুষ্ক মুখ, চোখের নিচে কে কালি মেড়ে দিয়েছে···

মীরা : এ বাহ্য—অবান্তর। অন্তরে যার মণি জ্বলছে সে কি চায়

বাইরের ধন, জন, সাজসজ্জা? না বাবা! বিশ্বাস করুন—আমি নিঃস্ব হ'য়ে বিশ্ব পেয়েছি।

রতন সিং (ক্ষুব্ধ কণ্ঠে): কিন্তু নিঃস্ব তোমাকে হ'তে হ'ল তো আমারি পাপে, মা! না, শোনো। আমি যে জোর ক'রে তোমার বিয়ে দিয়ে কত বড় মহাপাপ করেছি বুঝতে পেরেছিলাম সব-প্রথম—যে'দিন (মদনকে দেখাইয়া) এ এলো আমার কাছে ছুটে, বলল—তোমাকে ওরা কেমন ক'রে বিষ খাইয়েছিল।—মিথ্যে প্রবোধ দিও না আর। কেবল মা, পাপী যখন অনুতাপের আগুনে পুড়ে তাঁকে ডাকে তখন তিনি দয়া করেন। তাই বুঝি তোমাকে তিনি ফিরিয়ে দিয়েছেন আমার কোলে। এবার—তাঁর ক্ষমা যে পেয়েছে তাকে তুমিও ক্ষমা করো মা—ফিরে এসো আমার কোলে কোল জুড়ে। আমার রাজপ্রাসাদে তুমি থাকবে রাণী হ'য়ে।

মীরা (সানুনয়ে): পোড়া বীজে কি ফসল ফলে বাবা! যে একবার গোপালের স্বাদ পেয়েছে সে কি রাজপ্রাসাদ চাইতে পারে আর? আমি তো আর সে-মীরা নই যাকে আপনি ছোটবেলায় আদর করতেন কোলে চড়িয়ে। আমি যে শুনেছি তাঁর বাঁশি, বাবা! সে-ঘরছাড়া ডাক যে শোনে একবার সে কি আর পারে ঘরে ফিরতে?

রতন সিং: আমাকে কেন এমন ক'রে শাস্তি দিচ্ছ মা? যদি জানতে কী ভাবে কেটেছে আমার এই দুবৎসর! কত জায়গায় লোক পাঠিয়েছি তোমায় খুঁজতে। শেষে বৃদ্ধবয়সে নিজে বেরিয়েছি—পাগলের ম'ত গ্রামে গ্রামে খোঁজ ক'রে তবে পেয়েছি তোমার দিশা। তোমার মা নেই, কিন্তু আমি আছি, ভাইবোনরা আছে, আছে বন্ধু, ভক্ত কত—

মীরার মুখের সহসা ভাবান্তর দেখিয়া মধ্যপথে তিনি থামিয়া গেলেন। মীরার মুখ উদ্ভাসিত হইয়া উঠিল যেন এক দিব্য জ্যোতিতে···চোখে অশ্রু চিক চিক করিয়া উঠিল। সে উচ্ছ্বসিত কণ্ঠে গান ধরিয়া দিল

গান :

আমার কানু গোপাল শান্ত ··· সে বিনা জানি না কারে।
সে বিনা জানি না কারে···
চাই অন্তরে শুধু তারে।

যার অধরে মুরলী, চরণে নূপুর, শ্রীকণ্ঠে বনমালা,
যার কমল নয়ন, চপল চরণ, রূপে ত্রিভুবন আলা,
চারু শিখিচূড়া যার শিরে সখী, শুধু তারে চাই বারে বারে।
সখী, সে বিনা জানি না কারে··· চাই অন্তরে শুধু তারে॥

আমি পিতা মাতা সখা বন্ধু ছেড়েছি, দিয়েছি লো কুলে কালি,
সখী, ছেড়েছি জগৎ, মান অভিমান—চেয়ে শুধু বনমালী।
জপি' সাধুর চরণ লোকলাজভয় ছেড়েছি লো অভিসারে।
সখী, সে বিনা জানি না কারে··· চাই অন্তরে শুধু তারে॥

তারে বিরহে মিলনে, হরষে বেদনে, জনমে মরণে সাধি ;
জপি শুধু তারি নাম দিবানিশি—শুধু তারে জানি চিরসাথী।
সাধে বুনি' প্রেমবীজ প্রাণনন্দনে সিঞ্চি নয়নধারে।
সখী, সে বিনা জানি না কারে··· চাই অন্তরে শুধু তারে॥

আর কারে ভয় মন, সকলে যখন জেনেছে বিশ্বে সারা :
মহা সিন্ধুর বুকে মিশিল সিন্ধু, জলে মজে জলধারা !
আজ মীরা দাসী, নাথ—শ্যাম—যা হবার হ'ল সখী, একাকারে।
সখী, সে বিনা জানি না কারে··· চাই অন্তরে শুধু তারে॥

মদন (সাশ্রুনেত্রে, করযোড়ে): মা, অপরাধ নেবেন না—কিন্তু সব হারিয়ে যে পায় সর্বেশকে সে কি আর তাঁর কাছছাড়া হ'তে পারে কখনো ? আপনি তাঁকে বন্দী করেছেন—তিনি কোথায় পালাবেন বলুন ?—যেখানেই আপনি যাবেন তিনি যাবেন পিছু পিছু—আপনার ছায়ার ম'তন। তবে কেন দিন কাটাবেন আপনি বিভূঁয়ে বিদেশে—রাস্তায় রাস্তায় ? আপনাকে রাও রাজা অনুরোধ করেছেন কুরখিতে ফিরে যেতে। কিন্তু আমি এসেছি দরবার করতে আমাদের—মেবার-বাসীদের—তরফ থেকে। মা, আপনি ছিলেন রাজ্যলক্ষ্মী। তাই আপনি চ'লে আসার পর থেকে মেবারে একটি দিনও বৃষ্টি হয় নি—শুধু কালো ঝড় আর থেকে থেকে বাজ। প্রজারা যখন জানতে পারল উদয়বাইই আপনাকে বিষ দিয়েছিল তখন তারা ক্ষেপে উঠে চড়াও হ'য়ে তাঁকে ধ'রে এনে বিষ খাইয়ে মারে। মহারাণার ঘরে একদিন বাজ পড়েছিল—সেদিন থেকে তিনি রাতে ঘুমতে পারেন না ভয়ে। তিনি আর সে-মানুষ নেই মহারাণী! আপনি চ'লে আসার পর থেকে তাঁর মুখে কেউ আর হাসি দেখে নি—তিনি জীবন্মৃত অবস্থায় দিন কাটাচ্ছেন। আমাকে বলেছেন আপনাকে যে কোনো উপায়ে ফিরিয়ে আনতে। এমন কি, আপনি কোথায় আছেন খবর পেলে তিনি নিজে এসে আপনার পায়ে পড়তে রাজি। তাঁর অপরাধের সীমা নেই একথা সত্যি, কিন্তু আপনি যদি এখন তাঁকে দেখেন তবে আপনার দয়া হবে। সত্যি বলছি মা, বিশ্বাস করুন, তিনি অনেক বদ্‌লে গেছেন। তাছাড়া আপনি এবার ফিরলে আপনিই থাকবেন সবার মাথার উপরে—তিনি চলবেন আপনারি কথা শুনে। তাহ'লে আর তাঁর মতিভ্রম হবে না এ নিশ্চয়।

মীরা : তুমিও বিশ্বাস কোরো মদন : আমার কোনো ক্ষোভই নেই বিক্রমের 'পরে। কেমন ক'রে থাকবে যখন গোপাল দেখিয়ে দিয়েছেন

যে, আমার মধ্যেও যিনি তার মধ্যেও তিনি! কিন্তু একথার যে কী মানে তা কেমন ক'রে তোমাকে বোঝাবো বলো! যে দেখেছে সে বড় জোর বলতে পারে কী দেখেছে—কিন্তু যারা দেখে নি তারা শুনে বুঝবে কেমন ক'রে—দেখার মানে কী?

রতন সিং: সবই মানি মা! এটুকুও আজ আমি সর্ব্বান্তঃকরণেই স্বীকার করি যে তুমি আর আমার মেয়ে নও। এইমাত্র তুমি বললে: তুমি আর কারুর নও, শুধু গোপালের। একথা আমি মানি—যদিও মানতে—কেন জানি না—এখনো বুকের মধ্যে খচ খচ করে। কিন্তু সে অন্য কথা। আমার আজকের বলবার কথা শুধু এই যে তুমি যা দেখেছ তা আমরা দেখতে না পেতে পারি। কিন্তু আমরা যা চাক্ষুষ করছি তাতে যে দুঃখ রাখবার জায়গা পাচ্ছি না মা! তুমি—রাজরাণী, সোনার প্রতিমা—কিনা পথে পথে ভিক্ষে করবে—সইবে লক্ষ চোখের কলুষ দৃষ্টি, অনাহার, অনিদ্রা, অপমান…(অশ্রুরুদ্ধ কণ্ঠে) মা…আমি…আমি…

মীরা: (রতন সিংকে জড়াইয়া ধরিয়া): বাবা! কেন অকারণ দুঃখ করছেন আমার জন্যে? মনে করেন কি যা আমি পেয়েছি তার পরে কোনো না-পাওয়া আমাকে বাজতে পারে? বাবা! তাঁকে যে ভালো বেসেছে সে জানে সে-ভালোবাসার মানে কী, জানে—কেন তার পরে জগতের রূপ একেবারে বদ্‌লে যায়। আমি আর তো সে-মীরা নই যাকে আপনি রেখেছিলেন আপনার অজস্র স্নেহ দিয়ে ঘিরে—সুখের ফুলশয্যায়। সে-মীরা দুঃখে দেখত দুঃখ, অপমানে পেত কষ্ট, কারুর কাছে মাথা নিচু করবার কথা ভাবতেও পারত না। কিন্তু আজ-যে গোপাল আমাকে দেখিয়ে দিয়েছেন আমি তৃণের চেয়েও নিচু—তাঁর নামে ভিখারিণী। সে-মীরা যে-আশা যে-আকাঙ্ক্ষা নিয়ে ঘর করত এ-মীরার কাছে যে সে-সব হ'য়ে গেছে স্বপ্নের চেয়েও ফিঁকে, মরীচিকার চেয়েও মায়া, বাবা! আমার

আজকের জগতের সঙ্গে সেদিনকার জগতের কতটুকু মিল আছে বলুন তো! না। আপনি ফিরে যান—শুধু এই আশীর্বাদ করুন—যেন মুক্তা পাওয়ার পরও আর ঝিনুকের জন্যে হাত না বাড়াই। যেন মনে রাখতে পারি যে আমি স্বপ্নের অতীত পরশমণিকে পেয়েছি জাগরণের নিত্যসাথী।

রতন সিং (ক্লিষ্ট কণ্ঠে): ভিতরের দিক থেকে পেয়েছ মা—এ আমিও মানি। কিন্তু বাইরের দিক থেকে? কেমন ক'রে ফিরে যাব আমি তোমাকে এ-দূর বিদেশে এভাবে শীর্ণ, ছিন্নকন্থা, সর্বহারা—(অশ্রু আসিয়া তাঁহার কণ্ঠস্বর রুদ্ধ করিল)।

মীরা (সাশ্রুনেত্রে): সর্বহারা, বাবা? আমি? যে-আমি—

উচ্ছ্বসিত কণ্ঠে গান ধরিলেন:

নিয়েছি গোবিন্দেরে কিনিয়া সজনী, আমি
গোবিন্দে কিনেছি অতুল্য।
লোকে বলে: "এত দাম দিবে কে অবোধ?" শুধু
আমি জানি—এ নহে বাহুল্য॥

নাই রূপ গুণ ধন, দুর্লভ সে-রতন
কেমনে তবুও হ'ল আমারি!
ধ্যান জ্ঞান সাধনার জানি না কিছুই, শুধু
জেনেছি—প্রেমেরি আমি পসারী।
ছলীরই শিখিয়া ছল তারি আপনার নামে
কিনেছি নামীরে যে অমূল্য।
নিয়েছি গোবিন্দেরে কিনিয়া সজনী, আমি
গোবিন্দে কিনেছি অতুল্য॥

নয়নে আমার রাখি' প্রাণবল্লভে—আঁখি-
পল্লবে রচিব আড়াল রে!

জগৎ-ও বৈরী হ'লে সে-ধন হবে না চুরি,
লুটিতে পারে না তায় কাল রে !
বহু জনমের ক্ষতিপূরণ মিলেছে আজ,
তাই মীরা মিলন-প্রফুল্ল ।
নিয়েছি গোবিন্দেরে কিনিয়া সজনী, আমি
গোবিন্দে কিনেছি অতুল্য ॥

রতন সিং (চক্ষু মুছিয়া) : সব বুঝলাম···কিন্তু···তুমি থাকবে কোথায় মা ?

মীরা : যাঁর জন্যে বৃন্দাবনে আসা তাঁর চরণাশ্রয়ে, বাবা !

রতন সিং : চরণাশ্রয়ে—কার ?

মীরা : আমার গুরুদেবের ।

রতন সিং : গুরুদেব ? কে ?

মীরা (হাসিয়া) : ভুলে গেলে বাবা ? মনে পড়ে না সেই সকাল-বেলাকার কথা ?—সেই সন্ন্যাসীর—যিনি এসেছিলেন আমাকে—(বিগ্রহ দেখাইয়া) আমার গোপালকে দিতে ?

রতন সিং : কিন্তু—
মদন : আমার একটি শেষ অনুরোধ—

কথা শেষ হইল না—ভাবাবেশে কীর্তন গাহিতে গাহিতে স্নানার্থী সনাতনের প্রবেশ··· পিছনে শিষ্য বিহারী

সনাতন :

"এসো হৃদয়রতন," ডাকে সনাতন, "হৃদয়বৃন্দাবনে",
এসো বন্ধু, বিদেশে আজ ভালোবেসে—আলো হেসে কালো মনে ।
ওগো প্রেম-পারাবার ! যেথা অভিসার যাচে প্রতি প্রাণনদী,—
বলো তোমারে জীবনে বরিব কেমনে—না দাও দরশ যদি ?

(স-আঁখরে)

বহি একা… প্রভু এবিদেশে রহি একা…
তুমি কবে বঁধু, দেবে দেখা ?
শুধু তোমারে যে চায় কেন নাহি পায় ? দাও করুণায় দেখা।
দাও ঘুচায়ে বেদন পূর্ণ মিলন—সন্ধ্যায় ইন্দুলেখা।

রতন সিং (প্রণাম করিতে অগ্রসর হইয়া) : গুরুদেব—!

সনাতন (চিনিতে না পারিয়া) : আমি আজকাল বিষয়ীদের সংস্পর্শ এড়িয়ে চলি।

মীরা (করযোড়ে সম্মুখে আসিয়া) : কিন্তু গুরুদেব—!

সনাতন (মুখ ফিরাইয়া) : বিহারী ! ওকে বলো—

বিহারী (মীরাকে, সবিনয়ে) : মা, গুরুদেব ব্রত নিয়েছেন—প্রকৃতির মুখদর্শন করবেন না।

মীরা : প্রকৃতি ?

বিহারী (নতশিরে সকুণ্ঠে) : ব্রজে আমরা নারীকে "প্রকৃতি" বলি।

মীরা : উনি নারীর মুখদর্শন করেন না ?

বিহারী : না মা।

মীরা : কিন্তু এ যে অসম্ভব !

বিহারী (বুঝিতে না পারিয়া) : অসম্ভব ? কী ?

মীরা (দৃঢ়স্বরে) : আমার গুরুদেব জ্ঞানিচূড়ামণি ভক্তশ্রেষ্ঠ—মহাপ্রভুর অন্তরঙ্গ শিষ্য। তিনি এমন অসম্ভব ব্রত নিতেই পারেন না।

বিহারী : আপনি কী বলছেন মা ?

মীরা উচ্ছ্বসিতকণ্ঠে গান ধরিলেন :

আজ এসো হে মোহন, হৃদয়রতন, হৃদয়বৃন্দাবনে
সেথা প্রতি রাধা হিয়া যাচে উছসিয়া লুটাতে তব চরণে।

বঁধু, রাখিয়া ছলনা মীরারে বলো না আলো করি' কালো রাতি ঃ
ব্রজে পুরুষ কি পাবে বাসরবিহারে হ'তে তব লীলাসাথী ?

(স-আঁখরে)

নহে অভিমান কি গো বাধা ?
সেথা হয় কি শরণ সাধা ?
করে অভিমান যারা—পুরুষ তাহারা, পদে পদে পায় বাধা ;
তারা আজো জানে না কি গোকুলে একাকী তুমি শ্যাম—তারা রাধা ?
কোন্ হিয়া কবে হায় পেয়েছে তোমায় হ'তে যে না চায় রাধা ?

সনাতন (মীরার দিকে চাহিয়া সজল নেত্রে) : মীরা ? পুণ্যশীলা রাজকন্যা ?

মীরা (তাঁহার চরণে পড়িয়া) : না গুরুদেব !—ভিখারিণী রাজকন্যা।

রতনসিং ও মদন সনাতনের সামনে সাষ্টাঙ্গ হইলেন।

যবনিকা

উত্তরণিকা

পদ্মিনী

অপার্থিব অলৌকিক মা, জীবনকাহিনী তোমার,
ছিল যার মধ্যমণি—প্রেম প্রেম প্রেম আত্মহারা,
মধুচ্ছন্দ যার কাঁপে মন্ত্রময়ী কবিতার সম !
শুনিতে শুনিতে যেন এ-দৃশ্য জগৎ মনে হয়
ছায়াসম তব স্বপ্নকাব্যকারাপাশে ! যতক্ষণ
ছিলে মা নিরত তুমি তোমার স্মৃতিচারণে আজ,
আমার এ-হৃদয়ের বক্ষোচ্ছ্বাসে সে-কণিকা যেন
আমারি স্মৃতিচারণ সম ছিল উঠিতে ঝঙ্কারি' !
হরষ-বিষাদ, হাসি-অশ্রু, আশা-নিরাশা তোমার
সঙ্কলি' সে-স্পন্দমান আবেদনে যেন করি' লীন
আমার অনপনেয় মন্ময়তা ছিল বিরচিতে
এক কৃষ্ণ-তন্ময়তা—অতলে ডুবারি হ'য়ে যার
রূপান্তরিত যেন হয়েছিল পদ্মিনী মীরায় !
অনাদি অবতারীর ওগো ধন্যা সেবিকা, বল্লভা !
জীবনী তোমার রবে জাগরূক প্রতি ভক্ত হৃদে,
প্রতি প্রেম-পুরোহিত রাধাকৃষ্ণ-অভীপ্সায় তার
অন্তহীন উদ্দীপন লভিবে তোমার ইতিহাস
করিয়া স্মরণ। তব ধ্রুবতারানিভ দীপ্ত ছবি
নির্দিশায় বিশ্বাসের দিবে দিশা। হে পুরোগামিনী !

গভীর অরণ্যে পথ কাটিয়া অকুতোভয়ে তুমি
চলেছিলে একান্তিকা, প্রেম-সাধনায় কৃষ্ণপানে।
সে-পথে তোমার রক্তঝরা চরণের ছাপ আজো
আছে শুধু কালাস্তৃত পাতাঢাকা—নহে লুপ্ত কভু।
সে-পথে যখনি কেহ চলিবে—তুরভিসারে তার
হবে অনাবৃত সেই পদচিহ্ন করুণা-পবনে।
দিনানুদৈনিক ছন্দে করে যারা কৃষ্ণমন্ত্র জপ—
অচিনের, অধ্রুবের তবে তারা ধ্রুবের সম্বল
ত্যজিতে সাহস নাহি পায়। তাই বুঝি যুগে যুগে
অনসূয়া রাধা মীরা জন্ম লভে তন্ময় প্রেমের
আদর্শ তুলিতে দীপি'—আমাদের ক্ষীণালোক পথে
তাহাদের অলৌকিক জীবনের সাক্ষ্যে আলোকের
করিতে আশ্বাসদান : কৃষ্ণ নয় রূপকথা কভু,
সোনার হরিণ নয়—আছে যার রঙ, নাই তনু।
আমরা মলিন কৃপণের ম'ত মায়াসুখমোহে
ছায়ায় কায়ার ভ্রান্তিবিলাস বরিয়া ধূলিবুকে
কল্পি নীগারিকাদ্যুতি—ম্লান অভ্র করিয়া সঞ্চয়
যাচি স্বর্ণ-সার্থকতা—দৈনন্দিন যুক্তি বিচারের
অন্ধকূপে বন্দী রহি' মানস-অতীত চিদাকাশ
করি ভয়—পাছে সেথা না পায় আশ্রয় ভীরু মন।
অমিতাভ সৌন্দর্যের ছায়াপথ হ'তে হাতছানি
দেয় এক অনামিকা অলোকসম্ভবা : সেথা চায়
অন্তর আশ্রয়নীড়, শুধু হায় প্রাণ বলে : "না না,
অজ্ঞাতকুলশীলার নিমন্ত্রণ নহে বরণীয়।"

অতীত বিরচে দুর্গ—সংস্কারের অচলায়তন,
তাসের প্রাসাদ সম পড়ে সে ধ্বসিয়া কালো ঝড়ে
ক্ষণে ক্ষণে—তবু ডরি অনাগত-অভিসারে হায় !
হেন অবিশ্বাস-ভয়-সংশয়-তুফানে বিশ্বাসের
রক্ষিতে আলোকস্তম্ভ পাবে শুধু সেই অচঞ্চল
জীবনের জ্যোতি যার আরাধনা করে পূজারিণী
প্রেমের অভিসারিকা অঙ্গীকার করি' যে আপন
বেদনারে করে তারে রূপান্তরিত চেতনায়
দেখাযে যে ত্যাগ নহে কভু মিথ্যা যন্ত্রণাবিলাস :
সর্ব তরে সর্বত্যাগ আরোহণী—পরমানন্দের।
হেন দুরাশিনী শুধু পারে মর্ত্যে ঘোষিতে এ-বাণী :
"যে করে সন্ধান—পায়, যে করে বরণ হৃদয়ের
প্রেমের বাগ্দান—পায় অভয়ের প্রণযাঙ্গুরীয়।"
প্রণমি তোমারে তাই কৃতজ্ঞ অন্তরে—কৃপাভরে
আমারে দিয়েছ বলি' উৎসাহের পরম পারানি
এ-অকূলে, দিলে বলি' তব উপলব্ধির আশ্বাস।
আমি শুধু চাই আজ শুধাতে তোমারে : তুমি লভি'
পরম মিলন কালাতীত কৃষ্ণ পুরুষোত্তমের
কেন এলে ফিরে এই কালপারে এক গুণহীনা
সাধিকার তরে—যার আছে শুধু একটি পাথেয় :
কৃষ্ণতৃষ্ণা—নাই শক্তি অভীপ্সার, ত্যাগ-তপস্যার !
তুমি আমি তত দূরে যত দূরে প্রভাত প্রদোষ !
তনু তব জ্যোতির্ঘন, বাণী মন্ত্রময়ী, কান্তি তব
অপার্থিব লাবণ্যের নির্যাসে নির্মিত মনে হয়।

হেন তুমি কেন হ'লে আবির্ভূতা সহসা ভূতলে
আমার মতন ম্লান মৃন্ময়ীর কাছে—করে নি যে
স্বপ্নেও কল্পনা তার কোনোদিন—প্রজ্ঞাপারমিতা
কৃষ্ণপ্রিয়া শ্রীমতীর লভিবে সান্নিধ্য কি বা বাণী!

মীরা

দিয়েছি তোমারে দীক্ষা যে-যোগে—সেথায় অধিকার
আছে তব। কিন্তু শুধু প্রশ্নপথে নাই দিব্যজ্ঞান।
প্রজ্ঞা নয় শুধু তথ্যসঞ্চয়ন, ভাবের বিলাস:
অন্তরের তৃষ্ণাপদ্ম বহু সাধনায় তবে তার
দল মেলে কৃষ্ণপানে। এ-উন্মেষ নহে মা, সুলভ।
যেদিন লভিবে তুমি সে-বিকাশ—বলিব সেদিন
কোন্-সে লীলার তরে পরমকরুণাময় প্রভু
পাঠায়েছিলেন তাঁর নিত্য-সেবিকারে তব পাশে।
আজ শুধু বলি: দেন ভক্তাধীন প্রতি ভক্তে তার
আকাঙ্ক্ষিত বর। আমি করিয়াছিলাম এ-প্রার্থনা:
"জ্ঞানার্থীরে দিও জ্ঞান, দিও মুক্তি মুক্তিকামী জনে,
শক্তি-পিপাসুরে দিও অষ্ট সিদ্ধি, দিও যোগিবরে
নির্বিকল্প সমাধির মহাবর: আমি শুধু চাই
রহিতে তোমার ইচ্ছাধীনা চিরদাসী মীরা—যারে
দিয়েছ বল্লভ, তুমি চরণসেবার অধিকার
মানবী আধারে মর্ত্যে যে-অনুগতারে তুমি দিলে
'প্রাণাধিকা'-সম্বোধনে বহুমান—যবে ছিল তার
একটি গৌরব শুধু—পরম উপাধি কিঙ্করীর।"

(গাঢকণ্ঠে)

বরদ শ্রীনাথ করি' আমারে বাঞ্ছিত বরদান
রেখেছেন সেই হ'তে চরণচ্ছায়ায়। পরে তুমি
লভিলে মা জন্ম—তিনি করিলেন আমারে প্রেরণ
ধরণীতে। সেইদিন হ'তে আমি আছি ছায়াসম
সাথী তব—কবিতে তোমার ক্রমবিকাশে আমার
শক্তিসহায়তা-দান কৃষ্ণকৃপা হ'তে নিত্য লভি'
বল, বুদ্ধি, প্রণোদনা। কহিলেন আমারে শ্রীবাস:
"আমারে বরিবে মর্ত্যে যাহারা প্রেমের অঙ্গীকারে
তাদের বরণমাল্যতরে তুমি করিয়া চয়ন
আমার প্রেমের পদ্ম ভরিবে তাদের ফুলসাজি,
হবে সাধনার সাথী তাহাদের প্রহরে প্রহরে,
নিরাশায় দিবে আশা, বেদনায় চেতনা মহতী—
যতদিন কৃষ্ণদাস কৃষ্ণদাসী না লভে জীবনে
কৃষ্ণপ্রণয়ের রঙ্গ আনন্দের তুঙ্গতম চূড়া,
যে-শিখর চায় প্রতি রাধাহিয়া গূঢ় পিপাসায়,
যে-শিখরসিদ্ধি বিনা নাই কভু মুক্তি অভীপ্সার।"
বলিব না আমি বৎসে, আর কিছু আজ। বচনের
আছে এক সুগভীর মোহ—সাধনায় পদে পদে
কথা কবে লক্ষ্যভ্রষ্ট—অজ্ঞাতে সাধক কথারেই
গণে উপলব্ধি সম—উচ্চারণ-পুরোহিত যথা।

পদ্মিনী

সাবধান-বাণী তব শিরোধার্য। শুধু কোরো ক্ষমা
যদি পুছি শেষবার: যুগে যুগে কেন মুনি ঋষি

করিলেন তিরস্কৃত কথারে সাধনে তপস্যায় ?
কথা কি শুধুই অর্থহীন কথামালা, শক্তিহীন
পুষ্পধনু, দীপ্তিহীন দীপ ? কথা রচে নি কি কভু
আনন্দের আরোহিণী—দেয় নি কি আলোক আঁধারে ?

মীরা

করো অবধান বৎসে ! চাহি নি বলিতে আমি—কথা
হয় না সহায় কভু চেতনার আরোহণে। যবে
জোনাকিও দেয় আলোভরসা পথিকে রাত্রিবনে,
ক্ষীণ প্রদীপেও যায় কিছুদূর দেখা অন্ধকারে,
তবে শুধু কথা কেন নির্বাসিত হবে সাধনায় ?
শাস্ত্রবাণী, গুরুবাক্য, ভাগবতী গীতি, মন্ত্র, স্তব
পেয়েছে প্রতিষ্ঠা ভবে জীবনের সহযাত্রীরূপে।
অনাসৃষ্টি সেও সৃষ্টি, আবর্জনা সেও হয় সার,
ভ্রান্তিও সত্যের অগ্রদূতী, প্রতি বন্ধনশৃঙ্খলো
আন্তরিক সাধকের বেজেছে নূপুর হ'য়ে পায়।
প্রাণলীলারঙ্গমঞ্চে লীলাধীশ মহানটরাজ
প্রতি ছন্দভঙ্গে যবে দেন দিশা অনিন্দ্য ছন্দের,
অশুভও আনে যবে শুভসিদ্ধি জ্ঞানে বা অজ্ঞানে,
কথা কেন অন্তরায় হবে চেতনার আরোহণে ?
কে করিবে অস্বীকার—কথা ধরে আলো যুগে যুগে
বহু সন্ধানীর অন্বেষণে—করি' মার্জিত বুদ্ধিরে ?
নহিলে তোমার কাছে কথাচিত্রে কেন বর্ণিলাম
জীবনী আমার—যদি সে ব্যাখ্যানে না রবে ক্ষেমের
ঊর্ধ্বমুখী উদ্দীপনা ? শুধু বৎসে, রাখিও স্মরণে :

প্রগতির অভিযানে আজ যাহা সহায় সে কাল
সাধে বাদ ক্ষণে ক্ষণে। কথা যবে হয় মন্ত্র সম
সেক্ষণে বরদা কথা : কিন্তু যবে রচে ধ্বনিমোহ
আনে অন্তরাল হায় সত্যদৃষ্টিপথে। লভিয়াছ
কথায় পাথেয় তুমি কিছুদূর : কিন্তু আজ তব
এসেছে সে-লগ্ন—যবে কথারে করিয়া পরিহার
যেতে হবে নৈঃশব্দ্যের অভিসারে বরি' প্রাণতলে
প্রেমদিশা একাকিনী—ঐকান্তিক আত্মসমর্পণে,
যেথা নাই উপদেশে বলিবার কিছু আর—শুধু
আছে পূর্ণনিবেদনসাধনায় আপন ইচ্ছারে
কৃষ্ণের ইচ্ছার পায় দিতে প্রশ্নহীন বলিদান।
এ-মহতী সাধনায় তব সাথী রূপে আমি আজ
এসেছি তোমার কাছে হ'তে তব দৃষ্টির সহায়,
নিরাশায় দিতে আশা, বান্ধবীর সম এ-বিদেশে।
তুমি-যে সাধিকা তাঁর—যাঁর চরণাশ্রিতা সেবিকা
আমি জন্মে জন্মে তাঁর করিয়াছিলাম আরাধনা।
সূর্যটানে গ্রহ সম চলে প্রতি কৃষ্ণপ্রেমার্থিনী :
সে-প্রেমের প্রতিবিম্ব যেথাই দীপিয়া উঠে ভবে,
সেথাই রচিত হয় এক অতি আশ্চর্য বন্ধন :
সূর্যমুখী গ্রহতৃষ্ণা করে যথা অনুভব প্রাণে
সুগভীর আকর্ষণ প্রতি গ্রহ পানে—প্রদক্ষিণ
করে যে সূর্যেরে সম নিবিড় তৃষ্ণায়—সেই ম'ত
এসেছি বৈকুণ্ঠ হ'তে আমি সহচরী, তব পাশে :
কৃষ্ণেরে যে ভালোবাসে তারে আমি ভালোবাসি বলি'।

পদ্মিনী

নমো নমো হে অনিন্দ্যা, সর্বকান্তিময়ী, শুভার্থিনী!
করুণা যে পায়—জানে করুণার মর্ম শুধু সেই।
লভি' তব কৃপা আজ ধন্য গণি জন্ম মা, আমার!
গভীর নিশীথে তুমি দিলে দেখা—অশনি-তর্জনে
কাঁপে যবে প্রতি হিয়া। দেখ, প্রত্যাসন্ন কালো ঝড়!
জল স্থল মূর্ছাহতপ্রায় রহে চেয়ে রুদ্ধশ্বাসে,
বলিষ্ঠ হৃদয় যত কাঁপে ত্রাসে—কী জানি কী হবে—
নিঠুর করাল দৈত্য-চমূ যবে গর্জে চারিধারে!
দানবী ক্রূরতা লিপ্সা অন্ধকারে ছায় বসুন্ধরা।
এ-তমিস্রা-তুফানে মা কী করিব আমি একাকিনী
কৃষ্ণপূজারিণী—যবে অসুরবাহিনী দেয় হানা?
খদ্যোত নিশীথে শুধু করে ঝিকিমিকি—পারে না তো
সাধিতে আঁধারলুপ্তি। বন্ধ্যা মরুভূর বক্ষে হায়
কেমনে ক্ষণবর্ষণ বুনিবে মা কুসুমকানন?
কতিপয় কৃষ্ণভক্তে কৃষ্ণ করেছেন কৃপা—জানি।
তাঁর নামে বাহি' তরী অকূলপাথারে কতিপয়
নাবিক পেয়েছে দিশা, উত্তীর্ণ হয়েছে ঝটিকায়
প্রত্যয়-পাথারি লভি'—মানি। শুধু পুছি—মুষ্টিমেয়
কতিপয় মহাজন দিবে কোন্ পথের নির্দেশ
এ-অমেয় হাহাকারে—জাগাবে সে-কোন্ প্রত্যয়ের
ধ্রুবতারা কালো নভে? বৃন্দাবনকাহিনী সুদূর
কল্পকথা সম হায়, মনে হয় এ-নাস্তিক যুগে!

কতিপয় আস্তিকের অঙ্গীকার কী করিবে—যবে
অগণ্য নাস্তিক কবে অস্বীকার, বলে ব্যঙ্গহাসে :
"ধূসর ধরায় কোথা বৃন্দাবন শ্যামল-মুরলী ?
কে বা এ-অপ্রেমপুরে পেয়েছে দর্শন প্রেমলের ?
কুরূপের এ-নৈরাশ্যে কোথায় রূপের রাজধানী ?
নয়নে যা দেয় দেখা অন্তরালে তার সত্য যদি
থাকে কিছু—তবে সে না করিলে গ্রহণ রূপকায়া
মানিবে নয়ন তারে বরি' কোন্ দৃষ্টি-অঙ্গীকার ?"

মীরা

রচেছিল ধরাতলে যে প্রেমের বৃন্দাবন—তার
সে-সোনালি রাজধানী বাহিরের ধূসর জগতে
যদি নাও দেখা যায় আজ—কী বা আসে যায়—যদি
প্রেম তার আজো পারে প্রতিষ্ঠিতে প্রতি হৃদে সেই
আলোক-আনন্দধাম, চিরন্তন, মুরলীমধুর,
ফুটায়ে বেদনাকাশে চেতনার চিন্ময় চন্দ্রমা,
কালাধীন লোকে জ্বালি' কালাতীত সহস্রকিরণ ?—
দ দেখি—অন্তরের অন্তঃপুরে তাঁর আসা-যাওয়া
তেমনি অপ্রতিহত, আনন্দ-প্রত্যক্ষ, স্বয়ংপ্রভ ?
এ নয় কথার কথা : নয় বৃন্দাবনের কাহিনী
কবির কল্পনারাঙা, মায়া-ইন্দ্রধনুর জল্পনা,
ক্ষণস্বর্ণমৃগনৃত্য, সলিলে-আল্পনা, ভিত্তিহীন
অন্তরীক্ষ-নন্দনের মায়াতরুপল্লবমর্মর—

এই আছে···এই নাই! এ-ব্রহ্মাণ্ডলীলা নয় এক
স্বৈরাচারী খেয়ালীর খেয়ালের নিরর্থ বিলাস,
ক্ষণিক বুদ্বুদনৃত্য। ভ্রান্তিরঙ্গ নয় কান্তিময়।
যেথাই দুবভিসারে চায় হিয়ারাধা বিবচিতে
সুন্দরের ফুলশয্যা—সেথাই সে-সুন্দর আপনি
কুসুম চয়ন করি' সাজান শয়ন মিলনের।
দিনে দিনে প্রতি হিয়া রচে অভীপ্সার আরোহণী
গগনগোলোকমুখী—যেথা শ্রীমতীর আশীর্বাদে
শ্রীরাধাসালোক্য লভি' হয় সে হ্লাদিনী, শ্রীমন্তিনী।
রাধাশক্তি নহে কভু রূপকথা—প্রতি হৃদয়ের
কৃষ্ণমুখী দুরাশায় সে-ই রচে করুণার সেতু
লক্ষিত ও অলক্ষ্যের মাঝে—বরে যার লভে দাসী
মীরাও সাযুজ্য সর্বেশের—রচি' নব ছন্দে সুরে
রাধিকারি রাগমালা। যতদিন মর হিয়া রবে
নিয়তির পদানতা—ততদিন নাই শ্রীরাধার
বিশ্রাম মুহূর্ততরে। প্রতি অভিসারিকারে তিনি
সাঙ্গহীন বৈকুণ্ঠের মহানন্দ-মৃদঙ্গের তালে
দিতেছেন নৃত্যদীক্ষা—প্রতি প্রেমকলিকা সাদরে
করিছেন মঞ্জরিত করুণা-কিরণে। রাজবালা
মীরা যতদিন ছিল বিলাসিনী—ছিল সে মানবী :
যে-মুহূর্তে প্রার্থিল সে হ'তে শ্যামলীলাসহচরী
সে-মুহূর্তে কাটিয়া সে মানবতা-শৃঙ্খল লভিল
রাধিকা-কিঙ্কিণী-বর—ফলি' তার প্রাণে শ্রীমতীর
বিরহ-মিলন-হর্ষ-ব্যথা-হাসি-অশ্রু ইন্দ্রধনু

(আপন মনে আবছা হাসিয়া)

যে-আলোক-অধিপের প্রেম নিত্যলীলাভরে তার
রচেছিল শ্রীরাধার প্রেমঘন কৃষ্ণময়ী তনু
কৃষ্ণের অন্তরজ্যোতিঃপুঞ্জ-উপাদানে—সে তো নয়
আকস্মিক কভু—সে যে চিরন্তন, আনন্দসুন্দর,
স্থানহীন—বিরচিত অক্ষতির নিগূঢ় নির্যাসে।
আপন প্রেমের স্বাদ আস্বাদিতে এক হ'ল দুই,
নারায়ণ হ'ল নর, নর হ'ল নারী, শ্যামপ্রিয়া :
একাধারে যে কৃষ্ণের নূপুর, মুকুট, কণ্ঠমালা,
মনোরথ মুকুর, বর বরদা, গঙ্গোত্রী স্রোতস্বিনী,
প্রার্থনা-প্রেরণা তথা প্রার্থিনী বসনা—লভে স্বাদ
মাধ্যমে যাহার শ্যাম আপনার সুধাস্বরূপের।
আপনি পিছনে রহি' প্রিয়ার প্রতিভা প্রতিফলি'
তাই শ্যাম সৃজিলেন রাধিকার হিয়া চিরন্তনী
প্রতি অভিসারিকার শ্যামমুখী দুরাশার বুকে :
শ্যামহৃদিলীনা হ'য়ে তবু যে স্বতন্ত্র শ্যাম হ'তে,
তাপ যেথা জ্যোতি হ'তে, তরঙ্গ সাগর হ'তে যথা।

পদ্মিনী মীরাকে প্রণাম করিতে
মীরা ধরিলেন রাসলীলার গান :

সখী সুনরী কহী মুরলী ঘটাসী বনকে হৈ ছাঈ।
সুধা কানোঁসে লী প্রাণোঁমে আঁখোঁ নীর ভর লাঈ!
ভরে জোবনপে হৈ কলিয়াঁ, মনায়ে ভোঁরে রঙ্গ্ রলিয়াঁ,
মচী হৈ ধূম কুঞ্জনমে, অহা কিসে বহার আঈ!

পবন ইঠলাকে ঝূমে হৈ, রো জলমে চাঁদ চূমে হৈ।
কহীঁ ডালীপে মতরালী হো কোয়ল কূক হৈ গাঈ।

শশী তারোঁকে হৈঁ গহনেঁ সজীঁ লী রাতনে পহনে।
চলী টোলী হৈ সখিয়োঁকী রচায়ে রাস কন্‌হাঈ।

এই সময়ে পদ্মিনীর সমাধিভঙ্গ হইল। সঙ্গে সঙ্গে মীরা অন্তর্হিতা হইলেন। পদ্মিনী চোখ চাহিতেই দেখিলেন অসিত ভাবতন্ময় হইয়া সেই একই গান গাহিতেছেন একই সুরে তালে :

সখী শোন্ ঐ কোথায় মুরলী মেঘের ঘনিমায় পরাণ মন ছায়!
সুধা কানের পথে প্রাণে পশে—নয়নে বাদল উথলায়।
ভরা-যৌবন-উতল ফুলদল রচে উৎসব ভ্রমর চঞ্চল…
আনন্দ-স্বনে নিকুঞ্জবনে শ্রীকান্ত আহা, বসন্ত বিছায়!

করে সুষমায় মলয় উন্মন জলে চন্দ্রের কিরণ চুম্বন,
কোথায় বীথিকায় বিমুগ্ধ কোকিল ভাসায় এ-নিখিল গানের ঝর্নায!
শশী তারকার প'রে মণিহার সাজে রজনী ভূষায় বরদায়
সখী দলে দল বলে : "চল্ চল্—যেথা রাসে ডাকে শ্যামরায।"

পদ্মিনী

(সবিস্ময়ে)

এ কি স্বপ্ন?—এ-গান-যে গাহিতেছিলেন দেবী মীরা!
তাঁরই সুরে একতানে—

অসিত

(মৃদু হাসিয়া)

যে যেথায়ই করে কৃষ্ণনাম
গায় না কি তাঁরি সাথে একতানে—জ্ঞানে বা অজ্ঞানে?

শেষ

গুরুদাস চট্টোপাধ্যায় এণ্ড সন্স-এর পক্ষে
প্রকাশক ও মুদ্রাকর—শ্রীগোবিন্দপদ ভট্টাচার্য্য, ভারতবর্ষ প্রিণ্টিং ওয়ার্কস্
২০৩।১।১, কর্ণওয়ালিস ষ্ট্রীট, কলিকাতা—৬